শিক্ষা ও সমাজ

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত,
এম. এ., বি. টি., ডব্লু. বি. ই. এস.

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, ২৪-পরগণা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক (স্পেশাল কেডার), পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বৈগাছি বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়

ও

শ্রীমন্মথনাথ রায়, এম. এ., বি. টি., ডব্লু. বি. ই. এস.
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহকারী প্রধান সমাজ-শিক্ষা আধিকারিক

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship)

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, মানুষের চরিত্র গঠন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য ; শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশই কাহারও কাহারও মতে শিক্ষার লক্ষ্য ; আবার কেহ বলেন, শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন করাই শিক্ষকের কর্তব্য। কোন কোন মনীষীর মতে শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই সকল বিভিন্ন মতামত সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, সু-নাগরিক গঠন করাই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন দেখা যাক সু-নাগরিক কাহাকে বলে। যখন অনেক লোক মিলিয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে, তখন প্রত্যেকেরই প্রতি প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে সমষ্টির প্রতি সকলের কর্তব্য থাকে। সমাজের মধ্যে আমরা পরস্পরের সহিত এমনভাবে যুক্ত যে, সকলকে ছাড়িয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিতে গেলে নিজের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই হয় বেশী। যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রে বাস করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রের সকল অধিকার ভোগ করে, তাহাকেই বলে নাগরিক। এই সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন একটি রাষ্ট্রে বাস করিলেই সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায় না। ভোটাধিকার, সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতি সকল রকম রাজনৈতিক অধিকার যাহার আছে, সেই নাগরিক। এক দেশের নাগরিক যদি অন্য দেশে গিয়া বিপদে পড়ে, তাহা হইলে নিজের রাষ্ট্র তাহাকে রক্ষা করিবে। নাগরিককেও রাষ্ট্রের জন্য কিছু-না-কিছু করিতে . হয়। প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করিতে এবং প্রাণ দিতেও নাগরিককে প্রস্তুত থাকিতে হয়।

নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য ঃ

নাগরিকের অধিকার বলিতে কি বুঝায়? কোন নাগরিক একই রাষ্ট্রের অন্য নাগরিক ও রাষ্ট্রের নিকট হইতে যে সকল স্বত্ব দাবি করিতে পারে, তাহাকে নাগরিক অধিকার (Rights) বলে। নিজের ধর্ম আচরণ এবং নিজের সম্পত্তি ভোগ প্রভৃতির অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। রাষ্ট্র এই সমস্ত অধিকার স্বীকার করে এবং নাগরিকেরা যাহাতে ইহা অবাধে ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করে।

মানুষের অধিকারকে সাধারণতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) **নৈতিক অধিকার**—দেশে জনসাধারণের মধ্যে যে সকল নৈতিক নিয়ম প্রচলিত থাকে, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে নৈতিক অধিকার। নৈতিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সমাজের ও জনমতের। নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করিলে রাষ্ট্র কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে না।

(২) **পৌর অধিকার**—সভ্যজীবন যাপন করিতে হইলে এবং মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি-সমূহের বিকাশ-সাধন করিতে হইলে কতকগুলি অধিকারের প্রয়োজন। এইগুলিকে বলা হয় পৌর অধিকার। যেমন—

জীবন-রক্ষণের অধিকার (Right to live)—রাষ্ট্র মানুষের জীবন রক্ষা করিবে। দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরের শত্রুকে দমন করিয়া দেশের জনসাধারণকে নির্বিঘ্নে নিজ কর্তব্য পালন করিবার সুযোগ দিবে।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to liberty)—রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে অবাধে চলাফেরা করিতে পারে, রাষ্ট্রকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুলিস বা অন্য কেহ কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখিতে পারিবে না। অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া অবাধে চলাফেরা করার এবং নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকের থাকা উচিত।

সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার (Right to property)—মানুষ যে সম্পত্তি উপার্জন করে তাহা সে যাহাতে নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারে, সেদিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিজের অর্জিত সম্পত্তি ভোগ ও দান করিবার অধিকার না থাকিলে কোন ব্যক্তিই আগ্রহের সহিত কাজ করিতে চাহিবে না।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Right to worship)—একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক থাকিতে পারে। প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম অনুষ্ঠান করিবার অধিকার থাকিবে। কোন ব্যক্তি বা দল ইহাতে বাধা দিলে রাষ্ট্র তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণের অধিকার—প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রাখার ও উন্নতি করার অধিকার আছে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

মত-প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of speech)—প্রত্যেক নাগরিকের স্ব স্ব মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। এমন কি সরকারের নীতির সমালোচনা করিবার অধিকারও প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সাধারণ সভায় যোগ দিবার অধিকার (Right to attend a public meeting)—দল গঠন করিয়া আপন আপন চিন্তা ও ভাবধারা কার্যে পরিণত করিবার অধিকার সকল নাগরিকের আছে এবং থাকা উচিত।

শিক্ষালাভ ও কর্মের অধিকার (Right to education and work)—প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা অনুসারে কর্ম পাইবার অধিকার আছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারে এবং যোগ্যতা অনুসারে যে-কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারে। ইহা ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার থাকে। যেমন—

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের সরকার নির্বাচনের অধিকার আছে। ইহার অর্থ এই যে, নাগরিকেরা ভোট দিয়া আইনসভার সভ্য নির্বাচন করিবেন। ভারতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে। কেবলমাত্র বিদেশী, দেউলিয়া, বিকৃতমস্তিস্ক ব্যক্তি এবং কতকগুলি বিশেষ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নাই।

(খ) **সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকার**—যোগ্যতা থাকিলে যে-কোন নাগরিকই রাজ্যের যে-কোন চাকুরি লাভ করিতে পারে। জাতি বা ধর্ম কোন চাকুরি লাভের বাধা হইতে পারে না।

(গ) **আর্জি পেশ করিবার অধিকার**—নিজের অভাব-অভিযোগ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের জানাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights & Duties) ঃ

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে আছে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অধিকার থাকিলেই কর্তব্য থাকিবে। কর্তব্য পালন না করিলে অধিকার লাভ করা যাইতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নাগরিকদের যেমন কতকগুলি অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ দেয়, তেমনি প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য আছে। বিনামূল্যে কখন কোন জিনিস লাভ করা যায় না। রাষ্ট্রের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার লাভ করিবার মূল্য হিসাবে প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

নাগরিকের প্রধান প্রধান কর্তব্যগুলি কি, তাহা আলোচনা করা যাক।

(১) **আনুগত্য** (Allegiance)—রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা নাগরিকের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। দেশ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে দেশ-রক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া এবং প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকা। যে সকল রাজকর্মচারী রাষ্ট্রের কার্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে হইবে।

(২) **আইন মান্য করিয়া চলা** (Obedience to Laws)—রাষ্ট্র ভালভাবে পরিচালনা করিবার জন্য আইন প্রস্তুত করিতে হয়। নাগরিকের প্রধান কর্তব্য এই সকল আইন মানিয়া চলা এবং অন্যেও যাহাতে ইহা মানিয়া চলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নাগরিকের কর্তব্য।

(৩) **নিয়মিত করদান** (Payment of taxes)—প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে কর দেওয়া। সরকারী কাজ চালাইবার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। শাসনকার্য চালু রাখার জন্য নাগরিকদের নিয়মিত কর দেওয়া উচিত।

(৪) **ভোটাধিকার ব্যবহার করা** (Exercise of the right to vote)—রাষ্ট্রের যেমন উচিত নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া, তেমনি নাগরিকদেরও ভোটাধিকার ব্যবহার করা উচিত। নির্বাচনের সময় দেখা যায় যে, অনেকে ভোট দিতে বিরত থাকেন। ইহা উচিত নহে। নাগরিকেরা বিবেচনা করিয়া ভোট না দিলে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হইবে না। নির্বাচন-প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(৫) **জন-স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা**—প্রত্যেক নাগরিকের উচিত সমাজ ও জনসাধারণের স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। সরকারী কর্মচারী বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি জন-স্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করিলে তাহার প্রতিবাদ করা সকল নাগরিকের কর্তব্য।

গণতন্ত্র

কোন রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা যদি একজনের হাতে থাকে, তাহাকে একনায়কতন্ত্র বা ডিরেক্টরী শাসন বলা হয়। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া জার্মানী, ইটালী, রুশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে একনায়কত্বের উদ্ভব হইয়াছিল।

দেশের শাসন-ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী যখন দেশের জন সাধারণ, তখন তাহাকে গণতন্ত্র বলে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান প্রভৃতিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে।

সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে একই রকম বলা যাইতে পারে না। কোন কোন রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited or constitutional monarchy) আছে। সেখানে হয়ত রাজা আছেন। কিন্তু রাজার হাতে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা নাই। রাজা নামেমাত্র সমস্ত দেশের কর্তা। দেশের আইনসভার আস্থাভাজন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিরা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রীদের হাতে। মন্ত্রীরা থাকেন আইনসভার নিকট দায়ী। রাজার নামে মন্ত্রীরাই দেশ শাসন করেন। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited or constitutional monarchy) বলা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) ঃ

দেশের বা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক যদি সকলে সমবেত হইয়া আলোচনা ও ভোট দ্বারা আইন প্রণয়ন করে, দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করে, কর্মচারী নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) বলে। রাষ্ট্র ছোট এবং নাগরিকের সংখ্যা কম হইলেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) চালু হওয়া সম্ভব। পুরাতন কালে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রে এই প্রকার গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্ট্রগুলির আয়তন বিরাট এবং জনসংখ্যাও প্রচুর। কাজেই বর্তমান কালে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু থাকা সম্ভব নহে।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) ঃ

এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি শাসন পরিচালনা করে না। জনসাধারণ ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জনসাধারণের প্রতি-

নিধিদের লইয়া আইনসভা গঠিত হয়। আইনসভার প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করেন এবং কর্মকর্তাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। দেশের নাগরিকেরা সরাসরি শাসনভার গ্রহণ না করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি দ্বারা দেশ শাসন করে। এইজন্যই ইহাকে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) বলে।

গণতন্ত্রের গুণ :

গণতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, ইহাতে দেশের নাগরিকদের শাসক ও শাসিত এই দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় না। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ থাকে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে। কোন শ্রেণীর লোকের ভোটাধিকার না থাকিলে তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রে সকল শ্রেণীর ভোটাধিকার থাকে এবং তাহাদের প্রতিনিধি আইনসভায় থাকে বলিয়া তাহাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা কমই থাকে। গণতন্ত্রের একটি প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, ইহাতে দেশের লোক শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য উৎসাহিত হয়। দেশের লোক যখন বুঝিতে পারে দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে তাহাদের মতামতের মূল্য আছে, তখন তাহাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তাহাদের ঔৎসুক্য দেখা যায়। সরকার তাহাদের নিজেদের প্রতিনিধি দ্বারা এবং তাহাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত এই অনুভূতি হইতেই দেশের নাগরিকের মনে দেশাত্মবোধ জাগে।

গণতন্ত্রের ত্রুটি :

গণতন্ত্রের কোন ত্রুটি নাই একথা বলা যাইতে পারে না। গণতন্ত্রে সাধারণ লোকের হাতে ক্ষমতা দেওয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা ও রাজনীতি জ্ঞানের অভাব। দেশের বিভিন্ন সমস্যার সহিতও

তাহারা পরিচিত নহে। কাজেই এই সমস্ত লোক বা তাহাদের প্রতিনিধি-দের দ্বারা দেশের শাসন-ব্যবস্থা খুব ভালভাবে চলিতে পারে না।

অনেকে মনে করেন যে, সকলে সমান এই মতবাদের উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কর্মকুশলতা কমিয়া যাইতে পারে। যেহেতু সকলেই সমান, অতএব বিশেষজ্ঞের কোন স্থান নাই। সকলেই সব কাজ করিতে পারে, অতএব সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিবার সময় বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই। এই ধারণার ফলে সাধারণ লোক উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং তাহাতে কর্মকুশলতা হ্রাস হইতে বাধ্য।

কাহারও কাহারও ধারণা, গণতন্ত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকেই মনে করে যে, সে স্বাধীন এবং সকলের সমান। কাজেই কাহারও আদেশ মানিয়া লইতে চাহে না।

কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নহে। সাধারণ ভোটদাতাকে অজ্ঞ বলিয়া মনে করা উচিত নহে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কাহারও উপর কোন দায়িত্ব থাকিলে সে দায়িত্ব পালন করিবার মত যোগ্যতা অর্জন করিবার চেষ্টা করে। সব দিক দিয়া বিবেচনা কারলে বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে।

সার্বজনীন ভোটাধিকার (Universal adult suffrage) ঃ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকারের মধ্যে ভোটাধিকারকে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই অধিকারবলেই নাগারক রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক সকল শ্রেণীর লোককে ভোটাধিকার দেওয়াকে সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা বলে। ভারতীয় সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে—কেবলমাত্র যাহারা পাগল, দেউলিয়া বা কোন গুরুতর

অপরাধে দণ্ডিত তাহারাই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে বা বিপক্ষে কি যুক্তি আছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। রাষ্ট্রের বিধান প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই সরকারের নীতি নির্ধারণ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকা উচিত। যদি কোন ব্যক্তির বা শ্রেণীর ভোটাধিকার না থাকে, তাহা হইলে রাজ্যের আইন-পরিষদে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন সদস্য থাকিবে না। যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহারা রাষ্ট্রের মঙ্গল, অমঙ্গলের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িবে।

অনেক রাজনীতিক আছেন যাঁহারা সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে শতকরা ৮০ জনেরও বেশী নিরক্ষর, সেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার দিলে তাহাতে রাষ্ট্রের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আইনসভার নির্বাচনের সময় অশিক্ষিত ভোটদাতারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর বিশ্লেষণ করিতে না পারিয়া দুরভিসন্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইতে পারে।

আবার অনেকে বলেন যে, যাহাদের কিছু সম্পত্তি বা আয় আছে, কেবল তাহাদেরই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। নাগরিকদের নিকট হইতে যে কর আদায় হয়, তাহাই রাষ্ট্রের আয়। যাহাদের কোন সম্পত্তি আছে সাধারণতঃ তাহাদেরই কর দিতে হয়। অতএব যে কর দিয়া রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করে, তাহাকেই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। যে নাগরিক কর দেয় না তাহাকে ভোটাধিকার দিলে, পরের ধনে পোদ্দারি করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

বর্তমান কালে সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রায় সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রেই প্রবর্তিত হইয়াছে। লিখিতে ও পড়িতে না জানিলেই যে লোক অজ্ঞ বা মূর্খ হয়, তাহা ঠিক নহে। লেখাপড়া কিছু না জানিয়াও লোকে যথেষ্ট

বুদ্ধিমান হইতে পারে। নিরক্ষর বলিয়া কোন নাগরিককে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার না হওয়ার জন্য দায়ী রাষ্ট্র। অতএব নিরক্ষর বা অশিক্ষিত লোকদের ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া যাহাতে দ্রুত শিক্ষা-বিস্তার হয়, তাহারই ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ভারতের সংবিধান (Indian Constitution) :

প্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় কয়েকটি বিধিবদ্ধ আইন ও নীতি অনুযায়ী। এই সকল আইন ও নীতির সমষ্টিকে বলে সংবিধান (Constitution)। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত ভারত ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। ভারত-শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরই চরম অধিকার ছিল। ভারত স্বাধীন হইবার পর ভারতের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন বোধ হইল।

১৯৪৬ সালের মে মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রস্তাব অনুসারে ভারতের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নকল্পে একটি গণ-পরিষদ্ গঠন করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই গণ-পরিষদ্ সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন হইল এবং স্বাধীন ভারতের জন্য একটি নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের কার্যে লিপ্ত হইল। এই গণ-পরিষদ্ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি হইতে ভারতে চালু হইয়াছে।

সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি রাজ্য-সংঘ (Union of States)। চৌদ্দটি রাজ্য এবং ছয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল এখন এই রাজ্য-সংঘের অঙ্গ। যে সকল রাজ্য এবং অঞ্চল লইয়া ভারত ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে, তাহারা যাহাতে ইউনিয়ন হইতে বাহিরে যাইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শাসনের বিভাগগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয়, রাজ্যাধীন এবং যুগ্ম। কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহকে শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়া দুই

ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কৃষি, জলসেচ প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের সঙ্গে কেবল স্থানীয় স্বার্থ জড়িত, সে সব বিষয় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের শাসনাধীন। দেশরক্ষা, যানবাহন প্রভৃতি সর্বদেশীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। ইহা ছাড়া কতকগুলি যুগ্ম বিষয় আছে। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভা উভয়েরই আইন প্রণয়নের এবং শাসনের অধিকার আছে।

প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়েকটি রাজ্য সরকার থাকে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার মন্ত্রি-পরিষদ্ লইয়া গঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি (President)—রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্তা। কেন্দ্রীয় আইনসভার ও রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সভ্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির নিয়োগকাল পাঁচ বৎসর। রাষ্ট্রপতি-পদে একই ব্যক্তির একাধিকবার নির্বাচনে কোন বাধা নাই।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি পরিচালন বিভাগের সর্বাধিনায়ক। তিনি সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার পরামর্শানুযায়ী মন্ত্রি-সভার অন্যান্য মন্ত্রীকে তিনি নিয়োগ করেন।

রাজ্যগুলির উপরও রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা আছে। তিনি রাজ্য-পালকে নিয়োগ করেন। রাজ্যের আইনসভা যদি যুগ্ম বিষয় সম্বন্ধে কোন বিল পাস করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইবে না। কোন রাজ্য যদি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী না চলে, তাহা হইলে রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি রাজ্যটির শাসন-ভার নিজ হাতে গ্রহণ করিতে পারেন।

উপরাষ্ট্রপতি—কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের দুইটি সভার সদস্যগণ মিলিত-ভাবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। উপরাষ্ট্রপতি ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁহার প্রধান কাজ রাজ্য-পরিষদের সভাপতিত্ব করা। যদি কোন

সময় রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হইয়া পড়েন বা তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির পদাভিষিক্ত হইবেন।

মন্ত্রি-পরিষদ্—শাসনকার্য পরিচালনায় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ্ থাকে। রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধান মন্ত্রীকে এবং পরে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন। সাধারণতঃ আইন-পরিষদের সভ্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় এবং দুইটি পরিষদ্ হইতেই মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকালে যদি কোন মন্ত্রী আইন-পরিষদের সভ্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে কোন পরিষদের সভ্য হইতে হইবে। শাসন-বিষয়ক নীতি মন্ত্রিসভার অধিবেশনে নির্ধারণ করা হয়। মন্ত্রিগণের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও কার্যতঃ তাঁহারা তাঁহাদের কার্যের জন্য লোকসভার নিকট যৌথ-ভাবে দায়ী। যতদিন মন্ত্রি-পরিষদ্ লোকসভার আস্থাভাজন থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা পদে বহাল থাকিবেন।

কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ্ঃ

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার তিনটি অঙ্গ আছে—রাষ্ট্রপতি, রাজ্য-পরিষদ্ (Council of State) এবং লোকসভা (House of the People)।

রাজ্য-পরিষদ্ (Council of State)—অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় রাজ্য-পরিষদ্। ইহা একটি স্থায়ী সভা। তবে ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। রাজ্য-পরিষদের ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২৩৮ জন সভ্য রাজ্যগুলির আইনসভার নিম্ন-পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। যাঁহারা সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি ১২ জনকে মনোনয়ন করিবেন। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার-বলে রাজ্য-পরিষদের সভাপতি হইবেন।

লোকসভা (Parliament)—লোকসভার সভ্য-সংখ্যা অনধিক ৫২০। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন লোকসভার সভ্যরা। এই পরিষদ্ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। লোকসভার সদস্যগণ একজন পরিষদ্পাল (Speaker) ও একজন উপ-পরিষদ্পাল (Deputy Speaker) নির্বাচিত করেন। এই পরিষদ্ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়।

রাজ্য-পরিষদ্ ও লোকসভা এই দুইটি লইয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হইলেও লোকসভা অপেক্ষা রাজ্য-পরিষদের ক্ষমতা অনেক কম। মন্ত্রি-পরিষদ্ লোকসভার নিকটই দায়ী, রাজ্য-পরিষদের নিকট নহে। আয়-দাবি (Budget estimate) মঞ্জুর করিবার অধিকারী লোকসভা। রাজ্য-পরিষদ্ কেবলমাত্র ইহা আলোচনা করিতে পারে, অগ্রাহ্য দিতে পারে না। রাজস্ব সম্পর্কীয় বিল প্রথমে লোকসভায় উপস্থিত করিতে হইবে। অন্য বিষয়ের বিল প্রথমে যে-কোন পরিষদে উপস্থিত করা যাইতে পারে। বিলটি একটি পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা দ্বিতীয় পরিষদে উপস্থাপিত করা হইবে।

রাজ্য সরকার ঃ

প্রথমে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত রাজ্যগুলিকে "এ", "বি", "সি" ও "ডি" এই চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস হইবার পর হইতে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন কয়েকটি স্থান ছাড়া সমস্ত দেশটিকে ১৪টি রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই ১৪টি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া রাজ্যপাল (Governor) আছেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। যে সকল বিষয়ে রাজ্যের আইনসভার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে, সেই সব বিষয়েই রাজ্যপালের শাসন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

রাজ্যপাল প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে অপরাপর মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যপাল রাজ্যের মহাব্যবহারিককে (Accountant General), রাজ্যের লোকসেবায়োগের (Public Service Commission) সদস্যগণকে এবং রাজ্যের প্রধান হিসাব-পরীক্ষককে নিযুক্ত করেন। নূতন বৎসরের আয়-ব্যয়ের তালিকা আইন-সভায় উপস্থাপিত করিবার পূর্বে রাজ্যপালের অনুমতি লইতে হয়। রাজ্যপাল অপরাধীকে ক্ষমা করিতে বা তাহার দণ্ড হ্রাস করিতে পারেন।

মন্ত্রি-পরিষদ্—রাজ্যপালকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া মন্ত্রিসভা থাকে। আইনসভায় যে দলের সর্বাপেক্ষা অধিক সদস্য থাকে, তাহার নেতাকে রাজ্যপাল প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিসভা যতদিন বিধানসভার আস্থাভাজন থাকে, ততদিন তাঁহাদের কার্যে বহাল রাখা হয়।

আইনসভা—রাজ্যের আইনসভা রাজ্যপাল ও একটি বা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাব —এই ছয়টি রাজ্যের আইনসভায় দুইটি করিয়া কক্ষ আছে। উচ্চ কক্ষের নাম বিধান-পরিষদ্ (Legislative Council) এবং নিম্ন কক্ষের নাম বিধানসভা Legislative Assembly)।

বিধানসভা (Legislative Assembly)—৬০ হইতে ৫০০ জন সভ্য লইয়া বিধানসভা গঠিত হইবে। সভ্য-সংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। মোট জনসংখ্যার প্রতি ৭৫,০০০-এর জন্য একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। বিধানসভা ৫ বৎসরের জন্য গঠিত হয়। তবে রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে ইহার পূর্বেই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন কিংবা জরুরী অবস্থায় আরও এক বৎসর আয়ু বাড়াইতে পারেন। সভ্যগণ একজন পরিষদ্পাল ও একজন উপ-পরিষদ্পাল নির্বাচন করিবেন।

বিধান-পরিষদ্ (Legislative Council)—রাজ্যের বিধান-পরিষদ্ একটি স্থায়ী সভা। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর পদত্যাগ করিবেন এবং তাঁহাদের স্থানে অন্য সদস্য নির্বাচিত হইবে। বিধান-পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বিধানসভার সভ্য-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী হইবে না। বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য পৌরসভা প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত। আর এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে। যাঁহারা অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্বে স্নাতক (Graduate) হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এক-দ্বাদশাংশ এবং যাঁহারা অন্ততঃ তিন বৎসর কোন কলেজে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা এক-দ্বাদশাংশ সভ্য নির্বাচিত হইবে। বাকী সভ্যদের রাজ্যপাল সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সমবায়-আন্দোলনে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। সভ্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করিবেন। মন্ত্রীরা এবং মহাব্যবহারিক সদস্য না হইলেও উভয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন।

আইনসভার কর্ম-পদ্ধতি—বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আইনসভার উভয় কক্ষের সভা আহ্বান করিতে হয়। কোন বারের শেষ অধিবেশন তারিখ এবং পরের বারের প্রথম অধিবেশনের তারিখের মধ্যে ছয় মাসের বেশী ব্যবধান থাকিতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে বিধানসভার সিদ্ধান্ত চরম, বিধান-পরিষদের এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই। মন্ত্রিসভা বিধানসভার নিকটই দায়ী। বিধান-পরিষদের অনাস্থা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ে উভয় কক্ষের ক্ষমতার বিশেষ কোন তারতম্য নাই। আইনের প্রস্তাব উভয় কক্ষে গৃহীত হইয়া রাজ্যপাল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে আইনে পরিণত হয়। কোন আইনের প্রস্তাবে উভয় কক্ষে মতানৈক্য হইলে বিধানসভার দ্বিতীয় বারের গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রাজ্যের আইনসভা রাজ্য-সংক্রান্ত এবং যুগ্ম বিষয়ে আইন প্রণয়ন

করে। যদি রাজ্যের কোন যুগ্ম বিষয় সংক্রান্ত আইন কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার গঠন ঃ

রাজ্যপাল, বিধানসভা ও বিধান-পরিষদ্ লইয়া পশ্চিমবাংলার আইন-সভা গঠিত। এখানকার বিধান-পরিষদের সভ্য-সংখ্যা ৬০ জন ; ইহার মধ্যে ২০ জন পৌর-প্রতিষ্ঠান, জেলাবোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নির্বাচিত সদস্য। ২০ জন সদস্য বিধানসভার সভ্যেরা নির্বাচন করেন ; অন্ততঃ ৩ বৎসরের উপর স্নাতক হইয়াছেন এরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন এবং যাঁহারা মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন, তাঁহারা নির্বাচন করেন ৫ জন সদস্য। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সমবায়-আন্দোলন-বিশেষজ্ঞ-দের মধ্য হইতে ৯ জন সদস্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন।

বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা ২৫২ জন। সকলেই নির্বাচিত। বিধান-সভার সদস্য-সংখ্যার মধ্যে কয়েকটি আসন তপশীলভুক্ত জাতির জন্য এবং কয়েকটি আসন তপশীলী উপজাতিসমূহের জন্য সংরক্ষিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রামের উন্নতি (Rural Development)

ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রামীণ সভ্যতা বলা যাইতে পারে। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৩ জন গ্রামে বাস করে। গ্রামের উন্নতি-সাধন করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতি হইতে পারে না। কোন কাজে হাত দিবার পূর্বে আমাদের জানা উচিত প্রকৃত সমস্যা কি এবং কোথায় কি ভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রামের উন্নতি সাধন করিতে হইলে গ্রাম পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃত সমস্যা কি, তাহা সঠিকভাবে জানিতে হইবে।

গ্রাম-পর্যবেক্ষণ :

মহাত্মা গান্ধী গ্রাম্য অঞ্চলে বিকেন্দ্রীত স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার কথা বলিয়াছিলেন। একটি বড় গ্রাম বা কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম লইয়া একটি উন্নয়ন সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমিতির প্রধান কার্য গ্রাম পর্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা। প্রধানতঃ প্রত্যেক গ্রামের সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে :—

১। গ্রামের নাম—

২। পোস্ট অফিস—

৩। জেলা—

৪।
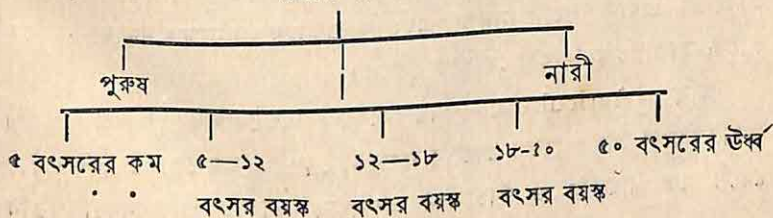
৯। স্বাস্থ্য—

১০। কুটিরশিল্প—

১১। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গ্রামের সমস্যা—পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে বর্তমানে ভারতের গ্রামগুলি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ ; শিক্ষিত এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। অশিক্ষিত এবং সঙ্গতিহীন মধ্যবিত্ত পরিবারই গ্রামে পড়িয়া আছে। গ্রামের উন্নতির সহিত ভারতের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতের প্রধান প্রধান সমস্যা এবং কি প্রকারে তাহাদের সমাধান হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

কৃষি (Agriculture)—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোকই কৃষিজীবী। দেশে যত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল প্রয়োজন তাহার প্রায় সবটাই কৃষি

হইতে পাওয়া যায়। ভারত হইতে যে সমস্ত জিনিস বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার বেশীর ভাগই কৃষিজাত দ্রব্য। আমাদের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগই কৃষি হইতে আসে।

কৃষিজাত ফসল—ভারতবর্ষে সবরকম মাটি, জলবায়ু দেখা যায় বলিয়া নানারকম ফসল উৎপন্ন হয়। ফসল দুই প্রকার—খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্য।

খাদ্যশস্য—খাদ্যশস্য হিসাবে **ধান** ও **গমের** স্থানই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ, আসাম ও উড়িষ্যার অধিবাসীদের ইহাই প্রধান খাদ্য। ভারতের সমগ্র আবাদী জমির ২৩ ভাগ জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ভারতে উৎপন্ন চাউল এই দেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। সেইজন্য বিদেশ হইতে চাউল আমদানি করিতে হয়।

ধানের পরই গমের স্থান। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে গমই প্রধান খাদ্য। কম-বেশী ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই গম উৎপন্ন হয়। তবে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও বোম্বাই অঞ্চলেই ইহার সমধিক চাষ হয়। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল দেশে গম উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয়। ভারতে মোট কর্ষিত জমির ৭·৮ ভাগ জমিতে গম উৎপন্ন হয়।

উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে যব উৎপন্ন হয়। ইহা মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জোয়ার, বাজরা, জনার উত্তর ভারতের সাধারণ লোকদের খাদ্যশস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দরাবাদ রাজ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

আখ—আখ অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মোট আবাদী জমির শতকরা ৪·৬ জমিতে আখ চাষ হয়। বিভিন্ন স্থানে উৎপাদনের হার কম-বেশী হইলেও মোটামুটি প্রতি একরে ৩০০ হইতে ৪০০ মণ আখ উৎপন্ন হয়। চিনির কলে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আখ সরবরাহ করা যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এবং অধিক

পরিমাণে গুড় উৎপাদন করিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বৎসরে ১৩ লক্ষ টন গুড় উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

পাট (Jute)—দেশ বিভক্ত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষই পাটের এক-চেটিয়া উৎপাদক ছিল। দেশ-বিভাগের পর পাট উৎপাদনের উপযুক্ত জমির শতকরা ৭৫ ভাগ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষকেই এখন পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করিতে হয়। ভারত সরকারের চেষ্টায় পাটের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় ইউনিয়নে ১০ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হইত। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ লক্ষ গাঁট। ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে পাট উৎপন্ন হয়।

তুলা—ভারতবর্ষে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। ১৭০ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৪০ লক্ষ গাঁট তুলা উৎপন্ন হয়। ভারতের কাপড়ের কলগুলির চাহিদা মিটাইবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তুলার উৎপাদন বাড়াইয়া ৫৫ লক্ষ গাঁট করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। তুলা উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান আমেরিকার পরেই। উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য-ভারত, গুজরাট এবং পূর্ব পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে তুলার চাষ হয়। লম্বা আঁশযুক্ত তুলা ভারতে যথেষ্ট জন্মায় না বলিয়া আমেরিকা ও পাকিস্তান হইতে ইহা আমদানি করিতে হয়।

চা (Tea)—চা প্রধানতঃ আসাম, পশ্চিমবাংলা, মাদ্রাজ, কূর্গ, ত্রিপুরা, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কোচিনে জন্মায়। বৎসরে প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ড চা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ হয়। উৎপন্ন চায়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষে নানারকম শস্য উৎপন্ন হইলেও ইহাতে দেশের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটে না। আমাদের দেশে আবাদী জমির পরিমাণ কম নহে কিন্তু উৎপাদনের হার কম। একজন জাপানী কৃষক প্রতি একরে গড়ে ২৩০৭ পাউণ্ড

এবং ইটালির কৃষক ৩০০০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন করে। কিন্তু ভারতীয় কৃষক গড়পড়তা প্রতি একরে মাত্র ৭৩১ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন করে। মিশর ও জাপানে যেখানে প্রতি একরে যথাক্রমে ১৬৮৮ পাউণ্ড ও ১৫০৮ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়, ভারতে সেখানে উৎপন্ন হয় মাত্র ৬৫১ পাউণ্ড।

ভারতের কৃষি-সমস্যা ঃ

যদিও ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এখানে আবাদী জমির পরিমাণও যথেষ্ট, তথাপি আমাদের চাহিদা অনুসারে শস্য এদেশে উৎপন্ন হয় না। ইহার অনেক কারণ আছে।

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইতেছে জমিগুলির ক্ষুদ্রায়তন। জমিগুলি ছোট ছোট এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইহার জন্য কোন কৃষকের পক্ষেই ভালভাবে চাষ করা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে জলসেচ-ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। কৃষককে জলের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। বৃষ্টি না হইলে যেমন ভাল শস্য উৎপন্ন হয় না, তেমনি অতিবৃষ্টিতেও শস্য নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত দরিদ্র। উৎকৃষ্ট বীজ এবং উন্নত-ধরনের যন্ত্রপাতি কিনিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাই এই বিংশ শতাব্দীতেও ভারতের কৃষকেরা পুরাকালের হাল-লাঙ্গল লইয়া চাষ করিতেছে।

অভাবের জন্য আমাদের দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট চড়া সুদে টাকা ধার করে। তাহার ফলে কৃষকেরা সুদই শোধ করিতে পারে না— আসল তো দূরের কথা।

ফসল-বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা না থাকার ফলে এবং আর্থিক অভাবের তাড়নায় অল্প মূল্যে মহাজনের নিকট ফসল বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া কৃষকেরা যথেষ্ট লাভ পায় না।

কৃষির কাজ বৎসরে ৭ মাসের বেশী থাকে না। অবসর সময়ে কিছু করিবার না থাকায় কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ৫ মাস আলস্যে কাটায়।

আমাদের দেশের কৃষকদের স্বাস্থ্য ভাল নয়। তাহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারে না এবং শিক্ষার অভাবের জন্য দেশ-বিদেশের উন্নত কৃষি-ব্যবস্থার কোন সন্ধান রাখে না।

কৃষির উন্নতি—কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হইবে। ফসল বিক্রয় এবং বীজ ক্রয় করিবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইবে। অল্প সুদে চাষীদের টাকা ধার দিবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশে খাল কাটিয়া, কূপ খনন করিয়া ও নলকূপ বসাইয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কুটিরশিল্প (Cottage Industry):

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কুটিরশিল্পের স্থান অতি উচ্চে। ১৯৫১ সালের আদম-সুমারি অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০·৩৮ ভাগ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত। ইহার মধ্যে আবার শতকরা ১·৫ ভাগ নিযুক্ত বৃহৎ শিল্পে এবং অবশিষ্ট ৮·৮৮ ভাগ কুটিরশিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ১৯৫০-৫১ সালে কুটিরশিল্প হইতে ৯১০ কোটি এবং বৃহৎ শিল্প হইতে ৫৫০ কোটি টাকা আয় হয়। জাতীয় জীবনে কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী হইলেও আমাদের দেশে কুটিরশিল্পের অবস্থা অতি শোচনীয়।

ভারত সরকারের অনুরোধে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা গোষ্ঠী (International Planning Team) ভারতের কুটিরশিল্পের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যে report দিয়াছেন, তাহা হইতে কুটিরশিল্পের অনগ্রসরতার কতকগুলি কারণ দেখা যায়:—

(ক) কুটিরশিল্পের কাজগুলি এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। উৎপাদনের ব্যবস্থা পুরাতন এবং যন্ত্রপাতিও পুরাতন। বর্তমান উন্নত-

ধরনের যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ না করার জন্য ভারতের শিল্পীরা পিছাইয়া পড়িতেছে।

(খ) কারিগরেরা অশিক্ষিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহিত তাহারা পরিচিত নহে। দেশীয় কারিগরদের উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবার পদ্ধতি শিখাইবার ব্যবস্থাও আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে।

(গ) আমাদের দেশের কারিগরেরা দরিদ্র। অর্থের অভাবে একসঙ্গে বেশী এবং ভাল কাঁচামাল কিনিতে পারে না। অনেক সময় মহাজনদের নিকট চড়া স্থদে টাকা ধার করিতে হয়। ইহার জন্য উৎপন্ন জিনিসের দামও বেশী পড়ে এবং জিনিসও উন্নতধরনের হয় না।

(ঘ) কুটিরশিল্প-জাত জিনিসগুলি বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা নাই। কারিগরেরা ভাল দামে জিনিস বিক্রয় করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের উপযুক্ত লাভ হয় না।

কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা—কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা কি? ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বেশী। এখানে বড় বড় শিল্পের সংখ্যা কম এবং মূলধনেরও অভাব। কাজেই অল্প মূলধন নিয়োগ করিয়া বেশী লোককে শিল্পে নিয়োগ করিতে হইলে, কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী।

কুটিরশিল্পের প্রসারের ফলে দেশে ধন-বণ্টনের স্থবিধা হইবে। বৃহৎ শিল্প বৃদ্ধি পাইলে কয়েকজন ধনীর হাতে অর্থ সঞ্চিত হয়। কুটিরশিল্পের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে বেশী অর্থ সঞ্চিত হইবে না, তেমনি অপরপক্ষে সাধারণ লোকের অবস্থা উন্নততর হইবে। আমাদের দেশের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ৭ মাস আন্দাজ ক্ষেতের কাজ করে, বাকী পাঁচ মাস আলস্যে কাটায়। কুটিরশিল্প দ্বারা এই সময়ে কৃষকেরা কিছু উপার্জন করিয়া নিজেদের সংসারের অভাব মোচন করিতে পারিবে। আমাদের দেশে গ্রাম অঞ্চলের মেয়েরা সংসারের

কয়েকটা কাজ করিয়া সারাদিন গল্প-গুজব করিয়া কাটায়। কুটিরশিল্পের সুযোগ থাকিলে অবসর সময়ে তাহারাও কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিবে।

প্রধান প্রধান কুটিরশিল্প—কুটিরশিল্পের অনেক অবনতি হইলেও ভারতে কতকগুলি কুটিরশিল্প বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় এখনও টিকিয়া আছে। ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি কুটিরশিল্পের কথা এখানে বলা হইতেছে।

(১) **তাঁত** (Handloom)—ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রচলিত কুটির-শিল্পের মধ্যে বয়ন-শিল্পের স্থান সর্বপ্রথম। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতবর্ষে যত বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ তাঁতে-বোনা। এদেশে বর্তমানে প্রায় ২২ লক্ষ তাঁত আছে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ লোক তাঁত বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাঁত হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ কোটি টাকার জিনিস উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই তাঁত-শিল্প চালু আছে। তূলা, পশম ও রেশম সূতা কাটা, কাপড় বোনা ও রং করা এই শিল্পেরই অন্তর্গত।

(২) **পিতল ও কাঁসার কাজ** (Metal work)—ইহা আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। উত্তর প্রদেশের বারাণসী ও মোরাদাবাদ, পশ্চিম-বাংলার মুর্শিদাবাদ এবং শ্রীনগরের কাঁসা ও পিতলের কাজ বিখ্যাত।

ইহা ছাড়া বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির পুতুল তৈয়ারি, হাতীর দাঁতের কাজ, শিঙের কাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে।

কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টা—বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকার বিবেচনা করিয়াছেন। কুটিরশিল্পের প্রসারের জন্য সরকার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সুযোগ দিয়াছেন। কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। মিলের কাপড়ের যে উৎপাদন-কর ধার্য আছে, তাঁতের কাপড়ের উপর হইতে তাহা উঠাইয়া

লওয়া হইয়াছে। তাঁতের কাপড় উৎপাদনে যে সুযোগ দেওয়া হয়, খদ্দরের জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয়, তাহা ক্রয় করিবার সময় কুটিরশিল্প-জাত জিনিসকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কুটিরশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। হাতের-তৈয়ারী জিনিসের উৎপাদনে উৎসাহ দিবার জন্য একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং বিদেশে ভারতের কুটিরশিল্প-জাত দ্রব্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাতীয় উন্নয়ন ব্লকের (Nation Extention Service Block) মারফতে গ্রাম অঞ্চলে কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্যও কয়েকটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। এই বোর্ডের কাজ হইতেছে কুটিরশিল্প সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তাহাকে কার্যে পরিণত করা। বিভিন্ন প্রকার কুটিরশিল্পের প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি স্থাপিত হইয়াছে :—

১। সর্ব-ভারতীয় তাঁত বোর্ড (১৯৫২ সালে স্থাপিত);

২। সর্ব-ভারতীয় কারুশিল্প বোর্ড (১৯৫৩ সালে স্থাপিত);

৩। সর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প-পরিষদ্‌;

৪। কেন্দ্রীয় রেশম পর্যদ্‌ (১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত);

৫। ছোট ছোট শিল্প পর্যদ্‌ (১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত)।

জন-স্বাস্থ্য :

জন-স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে পৃথিবীর সভ্যদেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান সর্বনিম্নে। ৭,৫০,০০,০০০ লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং প্রতি বৎসর প্রায় ৩,০০, ০০০ লোক এই রোগে মারা যায়। ভারতে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ এবং প্রতি বৎসর

প্রায় ৫ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতের ন্যায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ এত বেশী অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে লোকের রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি কমিয়া যাইতেছে। শতকরা ৩০টি পরিবার যে খাদ্য ব্যবহার করে তাহা যথেষ্টও নহে এবং সুসমও নহে। খাদ্য বিশ্লেষণ করিলে চর্বি (fat), খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) ও মাংসজাতীয় দ্রব্যের (protein) অভাব দেখা যায়। ভেজাল-মেশানো খাদ্যদ্রব্য জাতির স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিতেছে। জল-সরবরাহ ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নহে। শতকরা ৬টি শহরে সুরক্ষিত উপায়ে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা দেখা যায়। দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬'১৫ জন এবং শহর অঞ্চলের শতকরা ৪৮'৫ জন লোক মাত্র বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিবার সুযোগ পায়। এক লক্ষের বেশী অধিবাসীবিশিষ্ট মোট ৪৮টি শহরের মধ্যে মাত্র ২৩টিতে জল-নিকাশের জন্য ভূগর্ভের নীচে ড্রেনের ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি হাজারে ১৪'৪ জন। পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

অসন্তোষজনক জন-স্বাস্থ্যের কারণ—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পরিবেশ ও অবস্থার প্রয়োজন, তাহার অভাবের জন্যই ভারতে প্রতিরোধ-সম্ভাব্য রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী। দেশের অধিকাংশ স্থানেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব এবং পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যের অপ্রাচুর্যতার জন্য দেশবাসীর রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নহে। শিক্ষার অভাবের জন্যই জনসাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে না এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যায়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে লোকেরা যে খাদ্য খাইয়া থাকে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। তাহা সুসমও নহে এবং তাহার রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতাও কম। তাহা ছাড়া আমাদের যে হাসপাতাল ও চিকিৎসা-কেন্দ্র

আছে, তাহা আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কোন হাসপাতালেই রোগী-প্রতি গড়পড়তা ৪৮ সেকেণ্ডের বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, আমাদের দেশে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি আছে। হাসপাতালগুলির অবস্থাও সকল ক্ষেত্রে ভাল নহে। সারা ভারতে বর্তমানে প্রায় ৫০,০০০ ডাক্তার এবং ৫,০০০ শিক্ষাপ্রাপ্তা ধাত্রী আছে। সাধারণ ও বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৭৩০,০০০টি bed (শয্যা) আছে। প্রতি হাজার জনের জন্য ভারতের হাসপাতালে যেখানে ০·২৪টি bed আছে, সেখানে ইংলণ্ডে আছে হাজার প্রতি ৭·১৪টি এবং আমেরিকায় ১০·৪৮টি bed (শয্যা)।

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ-দাতা পর্ষদ্ (Central Advisory Board of Health) গঠন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিষয়ে সংযোগ স্থাপন করাই এই পর্ষদের কাজ। দেশ স্বাধীন হইবার পর কেন্দ্রে একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ WHO, UNICEF, Red Cross প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে স্বাস্থ্য-বিষয়ে পরামর্শ দান করে।

যান-বাহন (Communication) :

দেশে যান-বাহনের অবস্থা ভাল না থাকিলে উৎপাদন-ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাহত হয়। ভারত একটি বৃহৎ দেশ। দেশের আয়তনের তুলনায় যান-বাহনের ব্যবস্থা যে খুব সন্তোষজনক, তাহা বলা যায় না।

রেলপথ—ভারতের প্রায় সকল শহরই রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। এই দেশে ৩৪,৭৩৬ মাইল ব্যাপিয়া রেলপথ বিস্তৃত আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে ভারতের অপেক্ষা বেশী রেলপথ নাই। প্রায় সকল রেলপথই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। এশিয়ার মধ্যে ভারতের রেলপথই দীর্ঘতম। শতকরা ৮০ ভাগ মাল ও

শতকরা ৭০ জন আরোহী রেলপথ বহন করে। রেলপথে ১০০০ কোটি টাকারও অধিক মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই বিভাগে কাজ করে।

রেলপথ নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা ১৮৪৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্যন্ত ২২ মাইল দীর্ঘ রেলপথই ভারতের সর্বপ্রথম রেলপথ। ইহা জি. আই. পি. রেল কোম্পানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ই. আই. আর. কোম্পানির রেলপথ ১৮৫৪ সালের আগস্ট মাসে এবং মাদ্রাজ হইতে আরকোনা রেলপথ ১৮৫৬ সালে নির্মিত হয়।

ভারতের রেলপথগুলিকে ভালভাবে পরিচালনার জন্য ৭টি Zone বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। Zoneগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১	২	৩	৪
Zone বা বিভাগ এবং কোন্ দিন হইতে খোলা হইয়াছে।	পূর্বের কোন্ কোন্ রেলপথ ইহার অন্তর্গত করা হইয়াছে।	প্রধান কার্যালয়	বিস্তৃতি (মাইল)
১। দক্ষিণ বিভাগ (Southern Zone) ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫১	M. & S. M. and Mysore Railways	মাদ্রাজ	৬,০৬২·৮১
২। মধ্য বিভাগ (Central Zone) ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর	G. I. P., Nizam's State Railway, Dholepur & Sindhia Railway	বোম্বাই	৫,৬৩৩·৮৭

১	২	৩	৪
৩। পশ্চিম বিভাগ (Western Zone) ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর	B. B. & C. I., Saurasthra, Cutch, Rajasthan and Jaipur Railways, Murwar-Phulad section of Jaipur Railways.	বোম্বাই	৫,৬২০·৪০
৪। উত্তর বিভাগ (Northern Zone) ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল	Eastern Punjab, Jodhpur, Bikaner, E. I. Railwayএর তিনটি অংশ এবং B. B. C. I. Railwayএর একটি অংশ	দিল্লী	৬,৩৩৯·৯৩
৫। পূর্ব বিভাগ (Eastern Zone) ১৯৫৫ সালের ১লা আগস্ট	উত্তরের তিনটি বিভাগ ছাড়া E. I. Rly.	কলিকাতা	২,৫২০·৬৪
৬। দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ (South Eastern Zone) ১৯৫৫ সালের ১লা আগস্ট	B. N. Rly.	কলিকাতা	৩,৩৯৯·০৭

১	২	৩	৪
৭। উত্তর-পূর্ব বিভাগ (North-Eastern Zone) ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল	O. T. ; পুরাতন B. B. & C. I. রেলপথের ফতেগড় জেলা এবং Assam Railways.	গোরক্ষপুর	৪,৮০৫·৪৫

রেলপথের প্রয়োজনীয়তা—ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে রেলপথ সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রেলপথ নির্মাণের ফলে আমাদের দেশের কুটিরশিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে। রেলপথের সাহায্যে কলে-তৈয়ারী সস্তা জিনিসপত্র দেশের সর্বত্র সহজে প্রেরিত হওয়ার ফলে কুটিরশিল্প প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না। কুটিরশিল্প লোপ পাওয়ায় কারিগরেরা বেকার হইয়া কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হইল। ইহার ফলে জমির উপর চাপ পড়িল অত্যধিক। রেলপথের বাঁধ ও পুলগুলি জলের স্বাভাবিক স্রোতকে বাধা দেওয়ায় দেশে বন্যা হয়।

রেলপথ অপকার করিলেও উপকারও কম করে নাই। রেলপথের দ্বারা গ্রামের সহিত পৃথিবীর বাজারের যোগ স্থাপিত হইয়াছে। রেল হওয়াতে চালান দেওয়া সহজ হওয়ায় পাট, তূলা প্রভৃতির চাষ বাড়িয়াছে। রেলপথের জন্যই দেশে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে।

সামাজিক জীবনেও রেলপথের প্রভাব দেখা যায়। রেলপথের সাহায্যে সহজে এবং অল্প সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া যায় এবং দূরের লোকের সংস্পর্শে আসা যায়। ইহাতে দেশের শাসনকার্য পরিচালন সহজ হইয়াছে। ইহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, দেশের লোকের অনেক কুসংস্কার ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

রাজপথ—প্রত্যেক দেশেই ভাল পথের প্রয়োজন খুবই বেশী। কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করিবার সময় ভারতের প্রধান মন্ত্রী

শ্রীনেহরু বলিয়াছিলেন, "খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা অপেক্ষাও রাস্তা তৈয়ারি অধিক প্রয়োজনীয়।" যে-কোন দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ভাল রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশরক্ষার জন্যও রাজপথের আবশ্যকতা আছে। ভারতবর্ষের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অনগ্রসরতার জন্য ভাল রাস্তার অভাব অনেকটা দায়ী। গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার জন্য ভারতের গ্রামগুলি এত অনগ্রসর। ভারতের আয়তন ১২ লক্ষ বর্গমাইল কিন্তু ভারতে পথের মোট দৈর্ঘ্য ২,৫৫,৪৬০ মাইল। সেই জায়গায় ইংলণ্ডে ৯৪,০০০ বর্গমাইল আয়তনে ১,৮৪,০০০ মাইল পথ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩,০০০,০০০ বর্গমাইল আয়তনে ৩,০০,০০০ মাইল পথ আছে। পাশ্চাত্যের কয়েকটি উন্নত দেশের সহিত তুলনায় ভারতে পথের পরিমাণের একটা তুলনামূলক বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল :—

দেশ	এক লক্ষ লোক প্রতি রাস্তার পরিমাণ	দেশের আয়তনের বর্গমাইল প্রতি রাস্তার পরিমাণ
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২,৫০০	১·০৩
ফ্রান্স	৯৩৪	১·৮৪
গ্রেট ব্রিটেন	৩৯২	২·০২
ভারতবর্ষ	৮৯	০·২২

রাস্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকালই সজাগ ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মোগল সম্রাটেরা জাতীয় উন্নতির স্বার্থে কয়েকটি ভাল ভাল রাস্তা তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে শেরশাহের নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে লর্ড ডালহৌসী যখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন, সেই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল ও রাজপথ দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য Public Works Department স্থাপিত হয়। ১৯২৭ সালে M. K. Jayakarএর সভাপতিত্বে Road Development Committee

স্থাপিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে পথঘাট সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য Central Road Fund গঠন করিবার সুপারিশ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অনেক নূতন নূতন রাস্তা তৈয়ারি হইয়াছে। এইজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১৩.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। Grand Trunk Road, Orissa Trunk Road, কলিকাতা হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত National Highway প্রভৃতি ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজপথ।

জলপথ (Water-ways)—বহু পুরাকাল হইতে জলপথে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। ভারতের বড় বড় শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র নদীর তীরেই অবস্থিত। রেল চলার পর হইতেই এই দেশে জলপথের ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল। স্টীমার ও বড় বড় নৌকার চলাচল অনেক কমিয়া গেল।

বর্তমানে জলপথের প্রচলন সাধারণতঃ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও কেরালাতেই বেশী দেখা যায়। ভারতবর্ষে স্টীমার ও নৌকা চলাচলের উপযোগী ৫৭৬০ মাইল জলপথ আছে। ইহার মধ্যে ৩০০০ মাইল নদীপথ এবং বাকী কৃত্রিম খালপথ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ১৫২২ মাইল পথে স্টীমার চলাচল করিতে পারে, বাকী পথে দেশীয় নৌকা চলাচল করে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত জলপথে চলাচলের ব্যবস্থা হইবে। বোম্বাই রাজ্যের কারকাপুর পরিকল্পনা দ্বারা সমুদ্র হইতে দেশের অভ্যন্তরে ৫০ মাইল পর্যন্ত জলপথ বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। উড়িষ্যায় হীরাকুদ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে সমুদ্র হইতে দেশের অভ্যন্তরে ৩০০ মাইল পর্যন্ত জলপথ নাব্য হইবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়-বাণিজ্য রেলপথ ও রাজপথের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য জলপথের সংস্কার ও নূতন জলপথ স্থাপন

করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার Ganges-Brahmaputra Water Transport Board স্থাপন করেন। এই বোর্ডের উপর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীতে জলপথে উন্নতি বিধান করিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশের বড় বড় নদীগুলি কৃত্রিম খালের সাহায্যে যুক্ত করিয়া দিবার একটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

আকাশপথ (Air-ways)—উড়োজাহাজে যাত্রী ও মাল চলাচলের ব্যবস্থা বর্তমানে সব দেশেই করা হইতেছে। এই বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য ১৯২৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক Civil Aviation Department (অসামরিক বিমান বিভাগ) স্থাপিত হয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বিমান বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বিমান চলাচল আরম্ভ হয়। ১৯৪৬ সাল হইতে ভারত সরকার Air-ways Company গুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। কিন্তু কোম্পানি-গুলির আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে থাকায় ১৯৫৩ সালে পার্লামেণ্ট এক আইন পাস করিয়া সমস্ত এয়ারওয়েজ কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করে। দেশের মধ্যে সর্বত্র উড়োজাহাজ চলাচলের জন্য Airline Corporation নামে একটি প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে উড়োজাহাজ চালনার জন্য Air India International নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

জল-সরবরাহ (Water Supply) ঃ

ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে নদ-নদী থাকা সত্ত্বেও পানীয় জলের প্রাচুর্য দেখা যায় না। পল্লী অঞ্চলে লোকে সাধারণতঃ নদী বা কূপের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। আজ অনেক গ্রামেই নলকূপের ব্যবস্থা হইয়াছে। যেখানে নলকূপ আছে সেখানে নলকূপের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং কূপ, নদী ও পুষ্করিণীর জল অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে কলের জলের ব্যবস্থা আছে।

কলিকাতায় পানীয়ের জন্য পরিষ্কৃত জল এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করিবার জন্য অপরিষ্কৃত জলের ব্যবস্থা আছে।

আমাদের দেশের লোকেরা জলের যথাযথ ব্যবহার করে না। তাহার ফলে নানারকম অসুখ হইতে দেখা যায়। পল্লী অঞ্চলে অনেক জায়গায় দেখা যায়, যে পুষ্করিণী বা নদীর জল পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয়, সেখানেই লোকেরা স্নান করে এবং কাপড়-চোপড় কাচে। ইহাতে জল দূষিত হয় এবং নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। কলিকাতাতেও অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেকে অপরিষ্কৃত জল পবিত্র গঙ্গার জল মনে করিয়া তাহাতে স্নান করে এবং কাপড়-চোপড় কাচে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ অপরিষ্কৃত ও দূষিত জল পান করার জন্য সংক্রামিত হয়।

কৃষির জন্যও জলের প্রয়োজন। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকেরা চাষের জলের জন্য চাতক পাখীর মত আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। জমির নিকট পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদি থাকিলে সেখান হইতে পুরাতন পদ্ধতিতে জল সেচন করা হয়। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে মাঠের মধ্যে কূপ খনন করিয়া গরুর সাহায্যে জমিতে জলসেচ করার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা লাভের পর কয়েকটি নদীতে বাঁধ দিয়া জল আট্‌কাইয়া প্রয়োজনের সময় কৃত্রিম খাল দিয়া চাষের জন্য জল সরবরাহ করা হয়। আমাদের দেশের সমস্ত চাষের জমিতে জল সেচন করিতে হইলে D. V. C., হীরাকুঁদ প্রভৃতি আরও কতকগুলি পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা দরকার হইবে।

বিক্রয়-ব্যবস্থা (Marketing) :

আমাদের দেশের কৃষকেরা জমিতে যে ফসল উৎপাদন করে এবং গ্রামের শিল্পীরা যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহার উপযুক্ত দাম তাহারা পায় না। চাষী ও গ্রামের শিল্পীদের উৎপন্ন জিনিস দূরের বাজারে পাঠানো সম্ভব

হয় না। প্রথমতঃ তাহারা জানে না কোথায় কোন্ জিনিসের চাহিদা বেশী। তারপর চাষী ও শিল্পীদের উৎপন্ন স্ব স্ব জিনিস দূরের বাজারে পাঠাইতে যে খরচ হইবে, তাহা বহন করা সম্ভব নহে। ইহার ফলে দালালেরা গ্রামের চাষী ও শিল্পীদের নিকট হইতে অল্প দরে জিনিস কিনিয়া বেশী দামে অন্যত্র বিক্রয় করিয়া মোটা লাভ করে।

অনেক সময় চাষীরা বীজ বপন করিবার সময় দালালের নিকট অগ্রিম টাকা লয় ; শর্ত থাকে যে ফসল উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে। শিল্পীদেরও কাঁচামাল কিনিবার অর্থের অভাব হইলে দালালের নিকট হইতে দাদন লইতে হয় এবং উৎপন্ন জিনিস তাহারই নিকট বিক্রয় করিতে হয়। ইহার ফলে চাষী ও শিল্পীরা উপযুক্ত লাভ পায় না।

যখন নূতন ফসল উঠে তখন বাজারে দাম কম থাকে। কয়েক মাস ফসল ধরিয়া রাখিতে পারিলে ভাল দাম পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষকেরা দারিদ্র্য-বশতঃ ফসল কাটা হইলেই বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দালালগণ ফসল উঠিলেই কিনিয়া রাখিয়া দাম বাড়িলে বিক্রয় করে ; তাহাতে ভাল লাভ পায়। ফসল বিক্রয় করিয়া যাহা মোট লাভ হয় তাহার মধ্যে চাষী পায় মাত্র সাত আনা এবং দালাল পায় নয় আনা।

বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতি (Methods of improving marketing)— বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। সরকারের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া ফসল উঠিলে চাষীদের নিকট হইতে তাহা কিনিয়া লইয়া দাম বাড়িলে বিক্রয় করিবে। ইহাতে যে লাভ পাওয়া যাইবে তাহার কিছু অংশ সমবায় সমিতির খরচের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ চাষীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

গ্রামের শিল্পীদের মধ্যেও সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমবায় সমিতি শিল্পীদের কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া দিবে, উন্নতধরনের

যন্ত্রপাতি যোগাড় করিয়া দিবে-এবং উৎপন্ন জিনিস শহরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। প্রয়োজনমত শিল্পীদের টাকা ধার দিবার ব্যবস্থাও এই সমিতি করিবে। মাঝে মাঝে দেশের বড় বড় শহরে শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা-বিস্তার ঃ

সারা পশ্চিমবাংলায় ৩৫,০০০ গ্রাম আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩,০০০। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এখন প্রতি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নাই। বাংলা দেশে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক যত ছেলেমেয়ে আছে তাহার শতকরা ৬৮ জন স্কুলে যায়; এখনও বাকী শতকরা ৩২ জন ছেলেমেয়ে কোন স্কুলে পড়ে না। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৪ জন ব্যক্তির অক্ষর-জ্ঞান আছে। শিক্ষার বিস্তার না হইলে গ্রামের কোনরকম স্থায়ী উন্নতি আশা করা যায় না। কাজেই সরকারের প্রধান কর্তব্য গ্রামে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সব ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আনিবার ব্যবস্থা করা এবং যথেষ্ট সংখ্যক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া গ্রাম অঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬ হইতে ১১ বৎসরের সকল শিশুই যাহাতে বিদ্যালয়ে আসিতে পারে, সরকার তাহার জন্য জরিপ করাইয়া আরও কতকগুলি এবং কোথায় কোথায় বিদ্যালয় প্রয়োজন ও কত শিক্ষক প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ে যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে আসে, তাহার ব্যবস্থা ১৯৩০ সালের গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইনে (Rural Primary Education Act—1930) করা হইয়াছে; সেই আইন যাহাতে কার্যে পরিণত হয় এবং ছেলেমেয়েরা প্রথম শ্রেণীতে একবার ভর্তি হইয়া অন্ততঃ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ না করিয়া যাহাতে বিদ্যালয় ছাড়িয়া না দেয়, তাহা দেখিবার জন্য পরামর্শদাতা সমিতি (Advisory Committee) গঠন করা হইয়াছে। বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শহরে ও গ্রাম

অঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে অনেক যুবক আছে যাহারা অল্প কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া গ্রামেই থাকে। চর্চার অভাবে তাহারা যাহা কিছু শিখে তাহাও ভুলিয়া যায়। শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন স্থানে পুস্তকাগার (library) স্থাপন করিয়াছেন। চালু পুস্তকাগার-গুলিকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশ-বিদেশের সংবাদ যাহাতে গ্রামের লোকেরা জানিতে পারে, তাহার জন্য সরকার হইতে বিনা মূল্যে রেডিও দেওয়া হইতেছে। গ্রামের লোককে শিক্ষামূলক ছবি দেখাইবার ব্যবস্থাও সরকার হইতে করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা (Rural Development Scheme)

ভারতবর্ষে শহর অপেক্ষা গ্রামের সংখ্যা অনেক বেশী। শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক গ্রামে বাস করে। ভারতের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে গ্রামের দিকে নজর দিতে হইবে। গ্রামের উন্নতির জন্য ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

সমবায় সমিতি (Co-operative Society) ঃ

গ্রাম অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানের জন্য ভারতে প্রথম সমবায় সমিতি স্থাপিত হয় ১৮৯৫ সালে। বর্তমানে ভারতের সমবায় সমিতির সংখ্যা ১ লক্ষেরও উপর। প্রতি ৪ খানি গ্রামের জন্য একটি করিয়া সমবায় সমিতি আছে।

চাষের জমির উন্নতির জন্য এবং চাষীরা যাহাতে সঞ্চিত পূর্ব ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, তাহার জন্য জমি বন্ধকী সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে চাষের জমিগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত। ছোট ছোট জমির মালিকেরা স্বেচ্ছায় জমিগুলি এক সঙ্গে চাষ করিবার

এবং উৎপন্ন শস্য জমির পরিমাণ অনুপাতে মালিকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে।

জমিতে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিবার জন্যও সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। উৎপন্ন জিনিসগুলি একত্র করিয়া ভালভাবে গুদামজাত করা হয় এবং যখন বেশী দাম পাওয়া যায়, তখন এই জিনিসগুলি বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৮০০টি বিক্রয় সমবায় সমিতি আছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রামের লোকেদের মধ্য হইতে এই সমিতি গঠিত হয়। গ্রামের লোকেদের স্বাবলম্বী করা এবং তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করাই এই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য। সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতিগুলি এক সঙ্গে জিনিস ক্রয় এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, গ্রামের উন্নতি বিধান করে, চাষীদের মধ্যে ভাল বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করে। গ্রামে ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা এই সমিতিগুলির প্রধান কাজ বলা যাইতে পারে।

১৯০৪ সালে ভারত সরকার সমবায় ঋণদান সমিতি সম্বন্ধীয় আইন পাস করেন। এই আইন অনুসারে একই শহর বা গ্রামের কতকগুলি ব্যক্তি এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করিতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হইবে এই সমিতিগুলি এবং ইহার সভ্যেরা হইবেন অবৈতনিক। প্রত্যেক প্রদেশে এই সমিতিগুলিকে উপদেশ দিবার জন্য একজন করিয়া রেজিস্ট্রার আছে। ১৯১২ সালে আর একটি আইন পাস করা হয়। এই আইন অনুসারে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার এবং ইহার মারফতে গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলিকে (Rural Credit Society) অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন স্থানে ধীরে ধীরে সমবায় সমিতি গঠিত হইতেছে। সমবায় আন্দোলন পাঞ্জাবে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। পাঞ্জাবে পল্লী অঞ্চলের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তথাকার সমবায় সমিতির জন্য। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ভূমি খণ্ডগুলি সমবায় সমিতির সাহায্যে চাষ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেক গ্রামে উন্নত জীবনধারণ সমিতি (Better living societies) স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলির দ্বারা ঋণদান, ক্রয়, বিক্রয়, নলকূপ বসানো, পথ-ঘাটের উন্নতি, জল-নিকাশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর সরকার সমবায় আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও চালু সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্যের জন্য সরকার নানারকম চেষ্টা করিতেছেন।

পঞ্চায়েত :

কয়েকটি গ্রামের সভ্য লইয়া পঞ্চায়েত সভা গঠিত হয়। ইহাদের সভ্যসংখ্যা ৬ জনের কম এবং ৯ জনের বেশী হইবে না। সভ্যদের দ্বারা একজন 'সরপঞ্চ' বা সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা এবং এক বা একাধিক কর্মচারীর সাহায্যে গ্রামের বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করেন। এই সমস্ত পঞ্চায়েতের কার্য পরিদর্শন করিবার এবং পঞ্চায়েত সভার আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিবার জন্য একজন মণ্ডলাধিকারিক (Circle officer) থাকেন।

গ্রামের রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ও রক্ষণ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং ডাক্তারখানা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করা পঞ্চায়েতের কাজ। গ্রামে শান্তিরক্ষার জন্য পঞ্চায়েত কর্তৃক চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করা হয়। গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করাও পঞ্চায়েতের কার্য। জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষা করা এবং পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও পঞ্চায়েতের কাজ। ছোট

ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারও পঞ্চায়েত সভা করিয়া থাকে।

পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়—চৌকিদারী ট্যাক্সই পঞ্চায়েতের প্রধান আয়। গ্রামের খোঁয়াড় ও ফেরী হইতেও কিছু আয় হয়। মামলার ফি ও অপরাধীর জরিমানা হইতেও কিছু টাকা পঞ্চায়েত সভা পাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া জেলাবোর্ড ও সরকার হইতে পঞ্চায়েত সভাকে অর্থ সাহায্য করা হয়।

ভূমি-সংস্কার (Land Reforms):

অতি পুরাতন কাল হইতে এদেশে জমির উৎপন্ন ফসলের একাংশ সরকার দাবি করিয়া আসিতেছেন। রাজস্ব আদায় করিবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম ভূমি-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কাহার নিকট হইতে এবং কোন্ নীতি অনুসারে রাজস্ব আদায় করা হইবে, তাহাও সব সময় এবং সব রাজ্যে এক রকম নহে।

ভূমি-ব্যবস্থা মোটামুটি দুই রকমের—স্থায়ী ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত। স্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্ব পাকাপাকিভাবে ঠিক করা থাকে কিন্তু অস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার কিছুদিন পর পর রাজস্বের হার পরিবর্তন করেন। রায়তী, মহালওয়ারী ও মালগুজারী—এই তিন প্রকারের অস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

ভূমির সহিত ভারতের জনগণের বেশীর ভাগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হইলে ভূমি-সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

ভূমি-সংস্কারের উদ্দেশ্য—জমিদারী প্রথা অনুসারে জমির উপর জমিদারের অধিকার আইনতঃ এবং ধর্মতঃ অন্যায়। এইজন্যই আমাদের সংবিধানে ভূমি-সংস্কারের গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, আমাদের ভূমি-সংক্রান্ত আইন এইরূপ

হইবে যাহাতে দেশবাসীর আয়ের তারতম্য দূর করিয়া জমির উপর কৃষকের দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং গ্রামবাসীদের সমান মর্যাদা ও সুযোগ দেওয়া যায়।

পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)-এর সুপারিশ অনুসারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গত কয়েক বৎসরে নিম্ন প্রকার ভূমি-সংস্কার আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে :—

(১) **মধ্যস্বত্ব লোপ** (Elimination of Intermediaries)—সরকার এবং চাষী এই দুই-এর মধ্যে ছিলেন জমিদার। ইঁহারাই জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। অন্ধ্র, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, দিল্লী, আসাম, হায়দরাবাদ, মধ্য-ভারত, পেপ্সু, সৌরাষ্ট্র, ভূপাল, বিন্ধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে জমির মধ্যস্বত্ব লোপ আইন পাস করা হইয়াছে।

(২) **খণ্ডিত জমির একত্রীকরণ** (Consolidation of holdings) —জমির ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্তিকরণ রোধ করিবার জন্য কতকগুলি রাজ্যে আইন পাস করা হইয়াছে। জমির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহা অপেক্ষা কম হইলে জমি আর ভাগ করা চলিবে না।

(৩) পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন যে, সমস্ত রাজ্যে চাষের উপযুক্ত কত জমি আছে তাহা জরিপ করিতে হইবে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতের অন্তর্গত কয়েকটি রাজ্যে জরিপ করা হইয়াছে।

(৪) **সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য**—মধ্যবিত্ত লোকেদের দ্বারা খণ্ড খণ্ড জমি চাষ করা হইলে জমিতে উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণ বাড়ে না। সেইজন্য ছোট ছোট জমির মালিকদের সমবায় পদ্ধতিতে জমি চাষ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে। বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে।

(৫) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমির খাজনার হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া

হইয়াছে। খাজনার হার অবশ্য সমস্ত রাজ্যে সমান নহে। বোম্বাই ও রাজস্থানে জমির উৎপন্ন ফসলের $\frac{1}{6}$ অংশ খাজনার উচ্চতম হার বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছে। আসাম, হায়দরাবাদ, বিন্ধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের $\frac{1}{5}$ অংশ খাজনার হার হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পশ্চিম-বাংলায় চাষীকে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৪০ ভাগ দিতে হয় যদি সে চাষের সমস্ত খরচ বহন করে, কিন্তু যদি জমির মালিক চাষের খরচ বহন করে তাহা হইলে চাষীকে অর্ধেক দিতে হয় জমিদারকে।

(৬) **জমির পরিমাণ নির্ধারণ**—যে-কোন ব্যক্তি মোট কতটা বেশী জমি নিজের অধিকারে রাখিতে পারিবে, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন রাজ্যে আইন পাস করা হইতেছে। পশ্চিমবাংলায় কোন লোক ২৫ একর বা ৭৫ বিঘার বেশী জমির মালিক হইতে পারিবে না।

(৭) **সাধারণের ব্যবহারের জন্য জমি**—পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন যে, প্রত্যেক গ্রামে কৃষি ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমি আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আইন পাস করা হইয়াছে।

ভূদান আন্দোলন (Bhoodan Movement) :

১৯৫১ সালে ভূদান আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইহার উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে কৃষি-বিপ্লব আনয়ন করা। জমির মালিকদের নিকট জমি সংগ্রহ করিয়া ভূমিহীন ব্যক্তিদের দান করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রধান শিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৫১ সালে যখন হায়দরাবাদে গান্ধী-পন্থীদের একটি সম্মেলনে যোগদান করিতে যান, সেই সময় ভূমিহীন দরিদ্রদের ধনীদের দ্বারা স্বেচ্ছায় জমিদান করিবার কথা তাঁহার মনে জাগে। ১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল হায়দরাবাদের টেলেঙ্গা জেলার কতকগুলি অধিবাসী আসিয়া বিনোবাজীর নিকট অভিযোগ করে যে, তাহাদের কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও জমির অভাবে কাজ করিতে

পারিতেছে না। বিনোবাজী সেই সভাস্থলে প্রস্তাব করেন যে, যাহাদের জমি আছে এই রকম কোন ধনী ব্যক্তি ভূমিহীন দরিদ্রদের জন্য ভূমি দান করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? সভাস্থ এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার ২০০ একর জমি আছে ; তাহার অর্ধেক অর্থাৎ ১০০ একর জমি তিনি দান করিতে প্রস্তুত আছেন। এইখানেই ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত হয়।

বিনোবাজীর নিজের কথায় ভূদান যজ্ঞের উদ্দেশ্য হইতেছে—"ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থায় ভূমিতে সকলেরই অধিকার আছে। সেইজন্যই আমরা জমি ভিক্ষা করি না। কিন্তু যে জমিতে গরীবের অধিকার আছে, তাহারই এক অংশ দাবি করিতেছি। বিনা সংঘাতে সমাজের এই অব্যবস্থা দূর করিবার অনুকূলে প্রচার করা দরকার।" বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন, "ভূদান যজ্ঞ হ'চ্ছে বাস্তব জীবনে অহিংস নীতির প্রয়োগ।"

বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের দ্বারা ৫০,০০০,০০০ একর জমি ১০,০০০,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিনোবাজী পদব্রজে সারা ভারতবর্ষ পর্যটন করিতেছেন এবং যেখানে যাইতেছেন সেইখানেই ভূমি দান করিবার জন্য জনসাধারণকে আবেদন জানাইতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তাহাদেরই জমি দেওয়া হইতেছে কৃষিই যাহাদের একমাত্র জীবিকা অর্জনের উপায় এবং যাহারা নিজে দান করিতে প্রস্তুত আছে। গ্রামে একটা সভা আহ্বান করিয়া গ্রাম-বাসীদের মতানুসারে গ্রামের ভূমিহীন ব্যক্তিদের জমি দেওয়া হইতেছে। জমিদানের আর একটা শর্ত আছে। এই জমি বিক্রয় করা, ধার দেওয়া বা বন্ধক রাখা চলিবে না। যদি এই জমির সদ্ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে এই জমি গ্রামের জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। যতটা জমি সংগ্রহ করা হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ হারজনদের মধ্যে এবং বাকী অন্যান্য ভূমিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

যাহাদের জমি দেওয়া হইবে তাহাদের যন্ত্রপাতিও দিতে হইবে। সেইজন্য যন্ত্রপাতি কিনিবার অর্থের জন্যও আবেদন করা হইবে। ইহার জন্য মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি তহবিল হইতে ১,২০০,০০০ লক্ষ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে বিনোবাজী সম্পত্তি-দান, শ্রম-দান, বুদ্ধি-দান ও জীবন-দানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা

ভারতের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা (Educational system in India) :

আমাদের চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম ধাপে আছে নার্শারী স্কুল (Nursery School)। এখানে ৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাহার পরের স্তরই হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে ৬ হইতে ১১ বৎসরের শিশুদের পড়িবার ব্যবস্থা আছে। তাহার পরেই আরম্ভ হয় মাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তরে মধ্য বিদ্যালয় (Middle School) বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Senior Basic School) এবং উচ্চ বিদ্যালয় এই দুইটি বিভাগ আছে। মধ্য বিদ্যালয়ে ১১ হইতে ১৪ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ১১ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পড়িবার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হইলে ছেলেমেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর আই. এ. বা আই. এস্-সি. পড়িয়া থাকে এবং আই.এ. বা আই. এস্-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরে উপাধি লাভ করিতে পারে।

চল্‌তি ভারতীয় শিক্ষা সংস্থাকে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ—

(১) **প্রাথমিক বিদ্যালয়**—এখানে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) **মধ্য বিদ্যালয়** (Middle School)—এই স্তরে আঞ্চলিক ভাষা বা ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর—এই স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের তৈয়ারি করা হয়।

(৪) **Intermediate College** (আই. এ. বা আই. এস্-সি.)—ইহা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত।

(৫) **মহাবিদ্যালয়** (Degree College)—এইগুলি কোন-না-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

(৬) স্নাতকোত্তর বিভাগ এবং নিরীক্ষণ বিভাগ।

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (History of Education in brief) :

ইংরাজেরা ভারতে আসিবার পূর্বে এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল, তাহার সহিত বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার খুব সাদৃশ্য নাই। সে সময়ে প্রায় প্রতি গ্রামেই পাঠশালা ছিল বলা যাইতে পারে। সাধারণ লোকেরা এই পাঠশালায় জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযুক্ত লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিত। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ছেলেমেয়েদের কেহ কেহ টোলে সংস্কৃত এবং যাহারা রাজসরকারে চাকুরি করিতে চাহিত, তাহারা আরবী ও ফারসী শিক্ষা করিত। নবদ্বীপ, বারাণসী প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা দেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে গেলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য-

বিস্তার ও রাজস্ব-সংগ্রহ কার্যেই ব্যস্ত ছিল। শিক্ষা-বিস্তারের দিকে তাহাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। এদেশে শাসনকার্য চালাইবার জন্য কতকগুলি ইংরাজী-জানা লোকের প্রয়োজন দেখা দিল। তাই দেখা যায়, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই দেশে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেলের হাতে খরচ করিবার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ (১,০০,০০০৲) টাকা মঞ্জুর করে।

মেকলের পরামর্শ অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থির করে যে, "শিক্ষার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হইবে তাহা ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য খরচ করাই ভাল।" মেকলের নির্দেশ ও ১৮৩৫ সালের সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এদেশে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টায় এই নূতন বিদ্যালয়গুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তৃত হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার ও উন্নতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য বিভিন্ন কমিশন বসিয়াছে।

(১) **হাণ্টার কমিশন** (Hunter Commission)—১৮৮২ সালে এই কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ভার সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দিবেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদানের সুপারিশও এই কমিশন করেন।

(২) **বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন**—১৯০২ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ই মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন করিবে এবং তাহার জন্য নিয়মাবলীও প্রস্তুত করিবে।

(৩) **স্যাডলার কমিশন** (Sadler Commission)—এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসাবেই পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে আনা যায় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ১৯১৭ সালে Sir Michael Sadler-এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন সুপারিশ করেন Intermediate কলেজ স্থাপনের। এইগুলি পৃথকভাবে বা বিশেষ বিশেষ উচ্চ বিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে পরিচালনা করা যাইতে পারে। এই কমিশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এই যে, উচ্চ ও মাধ্যমিক কলেজীয় শিক্ষার জন্য একটি বোর্ড স্থাপন করিতে হইবে। এই বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিচালনার ভার থাকিবে।

(৪) **হার্টগ কমিটি** (Hurtogg Committee)—এই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষার উন্নতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য ১৯১৯ সালে হার্টগ কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির মত এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া সকল ছাত্রছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। এইজন্য এই কমিটি সুপারিশ করেন, যে সকল ছেলে বা মেয়ে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায়, তাহারা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাহাদের সাধারণ পাঠ শেষ করিবে। কমিটির মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী বহুমুখী হইবে। কমিটি ইহাও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হইবার পর অধিক সংখ্যক ছাত্রের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে কারিগরী ও শিল্প বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতে পারে।

(৫) **এবট-উড রিপোর্ট** (Abbot-Wood Report)—১৯৩৬-৩৭ সালে Abbot ও Wood নামে দুইজন শিক্ষাবিদ্‌কে শিক্ষার সংস্কার বিশেষ করিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য সরকার আমন্ত্রণ

জানাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত বহু ছাত্র তাহাদের গুণানুযায়ী কোন কাজ পাইতেছে না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্যই এই দুই শিক্ষা-বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

Abbot ও Wood-এর রিপোর্টে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হইয়াছে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে polytechnic নামে নূতন একপ্রকার কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে।

(৬) **সার্জেণ্ট রিপোর্ট** (Sargent Report)—দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা সমিতি (All India Advisory Board of Education) নিযুক্ত হয়। ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা Sir John Sargent-এর নামানুসারে এই সমিতি-প্রদত্ত রিপোর্ট সার্জেণ্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার জন্য আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বেশীর ভাগের শিক্ষা শেষ হইবে চৌদ্দ বৎসর বয়সে উত্তর বুনিয়াদী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করার পর। এই কমিটি ইহাও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য-সূচী প্রধানতঃ সংস্কৃতিমূলক হইলেও ইহা ছাত্রদের শিল্প, বাণিজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য তৈয়ারি করিবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা এগার বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসর কাল চলিবে। সাধারণ ও কারিগরী—এই দুই প্রকার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে,—কেবল শেষের দিকে শিশুরা জীবনে যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে তাহার জন্য তৈয়ারি করা হইবে।

(৭) কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতি ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ডাঃ রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও ব্যবহারিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি সম্বন্ধীয় শিক্ষার উপর কমিশন খুব জোর দিয়াছেন এবং সুপারিশ করিয়াছেন যে, কৃষি কলেজগুলি গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্রেরা গ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে পারে। এই কমিটি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের অবনতি হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। এই কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, চল্‌তি পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন এবং সরকারী চাকুরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য-দান সমিতি গঠনেরও সুপারিশ করিয়াছেন। এই কমিশনের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন। এই কমিশন মনে করেন যে, সরকার বা জনসাধারণ Intermediate Collegeএর সত্যকার উপকার উপলব্ধি করেন নাই। তাই Intermediate Collegeএর পরিবর্তে এগার বা বারো বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিন বৎসরের Degree Courseএর প্রবর্তন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

(৮) **মুদালিয়র কমিশন** (Mudaliar Commission)—ভারতে চল্‌তি মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ইহার উন্নতি-বিধানের নির্দেশ দিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫২ সালে ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের

(Dr. Lakshmanaswami Mudaliar) নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন নিম্ন প্রকার সুপারিশ করেন :—

(ক) প্রথম ৪ বা ৫ বৎসর প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরই আরম্ভ হইবে মাধ্যমিক শিক্ষা। এই স্তরে ভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও হস্ত-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(খ) আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ইহা ছাড়া রাষ্ট্রভাষা ও একটি বৈদেশিক ভাষাও এই স্তরে শিক্ষা দিতে হইবে।

(গ) সাধারণ সরকার (public) পরিচালিত পরীক্ষা ও শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার পরীক্ষাতে বিদ্যালয়ের record সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে।

(ঘ) অল্প বয়সে কারিগরী শিক্ষার দিকে ছেলেদের উৎসাহ দান করিবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় খোলা দরকার।

(ঙ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের বিভিন্ন ভাবে শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ, শিক্ষক-শিক্ষণ পর্ষৎ ও রাজ্য পরামর্শদাতা সমিতি থাকিবে।

(ছ) প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করিয়া রেজিস্টার্ড (registered) পরিচালক সমিতি থাকিবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় পদাধিকারবলে এই সমিতির সভ্য হইবেন।

মুদালিয়র কমিশনের report মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শদাতা সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন।

(৯) ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবাংলা সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করেন। Dey Commission নামেই ইহা সমধিক পরিচিত। Mudaliar Commissionএর সুপারিশগুলি পশ্চিমবাংলায় কতদূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই এই কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। Dey Commission মোটামুটিভাবে Mudaliar Commis-

sionএর সুপারিশগুলিই সমর্থন করিয়াছেন। Dey Commission বলিয়াছেন যে, বারো বৎসরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো নিম্ন প্রকার হইবে :—

১। প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ বৎসর।

২। Middle School, Junior Secondary অথবা Senior Basic School—তিন বৎসর (Classes VI—VIII)।

৩। Higher Secondary School (Classes IX—XI)—বর্তমান Intermediate Collegeএর পরিবর্তে High Schoolএ আর একটি class যুক্ত হইবে এবং তিন বৎসরের Degree Course কলেজে প্রবর্তিত হইবে।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত চলিবে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একই ধারায় শিক্ষা। তাহার পর চার বৎসর ছাত্রদের ক্ষমতা, রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী বহুমুখী শিক্ষাধারার ব্যবস্থা থাকিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা :

বর্তমান কালে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইতেছে এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিকেই শিশু-শিক্ষার আদর্শ পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা সার্জেণ্ট সাহেব বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ৪০ বৎসরের মধ্যে ভারতের সকল ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দান করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে ৬—১৪ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের বাধ্যতামূলক শিক্ষা সংবিধান চালু হইবার ১০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা পরিষ্কারভাবে Zakir Hossain Committeeএর reportএ বলা হইয়াছে। শিক্ষা বিষয়ক

কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা সমিতি (Central Advisory Board of Education) এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতি হইতেছে যে, কোন-না-কোন শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুদের হাতের-তৈয়ারী জিনিসের বিক্রয়-মূল্যে বিদ্যালয়ের কিছুটা খরচ উঠাইতে হইবে। শিশুদের যে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, প্রয়োজন হইলে ছাত্র সেই শিল্প দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জন করিতে পারে। বিদ্যালয়কে একটি ছোটখাট সমাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং শিশু হইবে সেই সমাজের একজন সভ্য। বিদ্যালয়ে শিল্প নির্বাচন করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, ইহার শিক্ষণীয় সম্ভাবনীয়তা কতটা আছে এবং ইহার মাধ্যমে শিশুদের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা কতটা বৃদ্ধি পাইতে পারে। শিল্প নির্বাচন করিবার সময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইবে।

নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে দ্রুত বিস্তার লাভ করে, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি All India Council for Elementary Education (অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ) গঠন করিয়াছেন। রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থার সভ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে এই সঙ্ঘ বা Council. এই সঙ্ঘ শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন, আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধান করিবার পন্থা নির্ণয় করিবে। শিক্ষক ও শিক্ষা-পরিচালকদের ব্যবহারের উপযুক্ত সাহিত্য রচনার ব্যাপারেও এই সঙ্ঘ ব্যবস্থা করিবেন। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি বুনিয়াদী শিক্ষা জাতীয় নিরীক্ষণ কেন্দ্র (National Centre for Research of Basic Education) স্থাপিত হইয়াছে।

সামাজিক শিক্ষা (Social Education) :

সামাজিক শিক্ষা বলিতে বুঝাইবে :—(১) অক্ষর জ্ঞান ; (২) ব্যক্তিগত

ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান; (৩) বয়স্কদের আর্থিক অবস্থা উন্নতির শিক্ষা; (৪) নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দান এবং (৫) সমষ্টি ও ব্যষ্টির নির্দোষ আনন্দ দানের ব্যবস্থা। সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা রূপায়িত করার দায়িত্ব সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন ও উপদেশ দেন। শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির একটি উপ-সমিতি সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারকে উপদেশ দেন।

সামাজিক শিক্ষা প্রসার করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন:—

(a) **সদ্য-শিক্ষিতদের জন্য লিখিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্য পুরস্কার দান**। ১৯৫৬ সাল হইতে সরকার প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষায় সদ্য-শিক্ষিত-দের জন্য লিখিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের লেখককে পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। (b) শিশু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য বিখ্যাত শিশু-সাহিত্য লেখকদের পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। (c) ভারতের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির জন্য সরকার ৫,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। (d) সদ্য-শিক্ষিতদের উপযুক্ত বই লেখার বিষয়ে লেখকদের শিক্ষা দিবার জন্য সাহিত্য কর্মশালা (Literary Work-Shop) পরিচালনা করা হয়। (e) বিভিন্ন রাজ্যে কথিত ভাষার সম্বন্ধে নিরীক্ষণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করা হয়। (f) শিশু-সাহিত্যের মান উন্নয়ন করিবার জন্য সরকার হইতে কতকগুলি আদর্শ শিশু-সাহিত্য লেখাইবার চেষ্টা করা হয়। (g) ভাল সাহিত্য লেখার জন্য উৎসাহ দান ও ইহা জনসাধারণ যাহাতে অল্প দামে পাইতে পারে, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি National Book Trust স্থাপন করিয়াছেন। (h) হিন্দীতে শিশুদের উপযুক্ত বই লেখার বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর হইতে পুস্তক-প্রকাশকদের নিকট খরচের একটা অগ্রিম হিসাব চাওয়া হইয়াছে। (i) শ্রব্যদৃশ্য শিক্ষা

(Audio-Visual Education)—কেন্দ্রীয় Film Library বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষামূলক film দেখাইবার একটি জাতীয় শ্রব্যদৃশ্য শিক্ষা-সংসদ (A National Audio-Visual Board) স্থাপিত হইয়াছে। Audio-Visual শিক্ষা সম্বন্ধে Seminar (শিক্ষা-শিবির)-এর ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করা হয়। জাতীয় শ্রব্যদৃশ্য শিক্ষা পর্ষৎ (A National Board of Audio-Visual Education) স্থাপনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। (j) সমাজ শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে Community Centre অন্যান্য শিক্ষা-সংসদের সহিত সংশ্লিষ্ট পাঠাগারের উন্নতির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। সাধারণ পাঠাগারগুলির উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য পাঠাগার (State Library) স্থাপিত হইয়াছে এবং রাজ্য পাঠাগার (State Library) হইতে জেলা পাঠাগার-গুলিতেও (District Library) বই দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রভাষা (Federal Language):

ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দী ভাষাই হইবে দেশের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সকল রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হিন্দী আবশ্যিকভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (University Commission) বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় গঠনকালে ছাত্র-ছাত্রীদের রাষ্ট্রভাষা জানিতে হইবে। হিন্দী ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ-গুলির পরিভাষা স্থির করিবার জন্য ১৯৫০ সালে একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পর্ষৎ (Board of Scientific Terminology) গঠন করা হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরের উপযুক্ত Physics, Chemistry, Botany, Mathematics, Social Studies ও Agricultureএর হিন্দী পরিভাষা প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৫১ সালে হিন্দী প্রচার ও উৎকর্ষের জন্য হিন্দী শিক্ষা সমিতি (Hindi

Siksha Samity) নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। বেনারস নাগরী প্রচারিণী সভা (Nagri Pracharini Sabha, Beneras) সরকার হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেছে। (১) হিন্দীতে একখানি নূতন বর্ধিত সংস্করণের অভিধান; (২) দশ খণ্ডে বিভক্ত একখানি হিন্দী Encyclopaedia; (৩) ভাল ভাল হিন্দী পুস্তকের সস্তা সংস্করণ এবং (৪) একখানি হিন্দী ভাষার ইতিহাস প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Technical and Professional Education):

কয়লা, লোহ, ম্যাঙ্গানিজ (manganese), সোনা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই দেশ উন্নত হয় না। প্রকৃত সম্পদ পৃথিবীর বক্ষে থাকে না। দেশবাসীর বুদ্ধি ও কৌশলই দেশের উন্নতি সাধন করিতে পারে। পশ্চিমের দেশগুলির সমকক্ষ হইতে গেলে বিভিন্ন শিল্পে যে সকল লোক নিযুক্ত আছে তাহাদের উন্নত ধরনের কারিগরী শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি তাহাদের কাজে লাগাইতে পারে। কারিগরী শিক্ষা মানুষের হস্ত ও মস্তিষ্ক বিকাশের সহায়তা করে। পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই কারিগরী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

ভারত সরকার কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ভারত সরকার ১৯৪৫ সালে অখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সমিতি (All India Council of Technical Education) স্থাপন করিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন ব্যবসায়, শিল্প ও শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে এই সমিতি। দেশে কারিগরী শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে সরকারকে উপদেশ দেওয়াই এই সমিতির কাজ। এই সমিতির উপদেশ অনুসারে ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি জাতীয় পরীক্ষাগার (National Laboratories) এবং

কতকগুলি কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। খড়্গপুরে Indian Institute of Technology এবং ব্যাঙ্গালোরে Indian Institute of Science স্থাপন করিয়া ভারত সরকার দেশের কারিগরী শিক্ষায় নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। খড়্গপুরে Indian Institute of Technologyতে পূর্ব স্নাতক-স্তরের ১,৬০০ জন এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ৪০০ শত ছাত্রের কারিগরী শিক্ষা লাভ করিবার ব্যবস্থা আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কানপুরে আরও তিনটি উচ্চ কারিগরী শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইতেছে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল Engineering College আছে সেগুলিকে উন্নত করিয়া স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মুদ্রণ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও এলাহাবাদে চারিটি School of Printing স্থাপিত হইয়াছে।

শহর ও গ্রাম স্থাপনার পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য দিল্লীতে একটি School of Town and Country Planning স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবসায় পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে ও দিল্লীর Central Institute of Educationএ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোম্বাই রাজ্যের কোলাপুর জেলায় গ্রাম্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা (Education of the Handicapped and Social and Child Welfare):

সারা ভারতবর্ষে বিকলাঙ্গের সংখ্যা কত তাহার সঠিক পরিসংখ্যান আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। এই বিকলাঙ্গেরা সমাজের গলগ্রহস্বরূপ বাঁচিয়া থাকে। সকল পাশ্চাত্য দেশে বিকলাঙ্গদের কোন-না-কোন বৃত্তি শিক্ষা দিয়া সমাজের প্রয়োজনীয় নাগরিক হইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

বিকলাঙ্গদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন—(১) অন্ধ, (২) মূক ও বধির এবং (৩) যাহাদের বোধশক্তি অত্যন্ত কম। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, একটি ইন্দ্রিয় বিকল হইলেও বিকলাঙ্গদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ এব' কর্মক্ষম থাকে। যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বিকলাঙ্গেরা খুব তাড়াতাড়ি কোন কোন বিষয় শিখিতে পারে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিকলাঙ্গদের শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য গঠিত হয় জাতীয় উপদেষ্টা সমিতি (National Advisory Council for the Education of the Handicapped)। বিকলাঙ্গদের বিদ্যালয় কয়েক রকম হইতে পারে। যেমন—(১) অন্ধ ও মূক এবং বধিরদের বিদ্যালয়; (২) বুদ্ধিহীনদের জন্য বিদ্যালয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার বিষয় হইতেছে যে, এই সমিতির চেষ্টায় ভারতীয় ভাষায় ব্রেলি পরিভাষা (Braile Code) রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে। যুদ্ধে যাহারা অন্ধ হইয়াছে তাহাদের জন্য দেরাদুনে যে Hostel ছিল, ১৯৫৬ সাল হইতে তাহার পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। দিল্লীতে একটি Braile Press স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ভারতীয় সকল ভাষায় Braile পুস্তক ছাপানো হইতেছে।

শারীরিক শিক্ষা (Physical Education) :

শরীর ও মনের মধ্যে আছে গভীর সম্বন্ধ। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে শরীর ও মনের সম্যক্ বিকাশ বুঝায়। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত আমাদের দেশে মানসিক বৃত্তিগুলি বিকাশের চেষ্টাই করা হইয়াছে। শারীরিক উন্নতির জন্য খুব বেশী যত্ন করা হয় নাই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমাদের জাতীয় সরকার শারীরিক শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দিয়াছেন। শারীরিক শিক্ষা ও চিত্ত-বিনোদনের উপায় সম্বন্ধে সরকার উপদেশ দিবার জন্য শারীরিক শিক্ষা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষৎ (Central Advisory Board of Physical Education and Recrea-

tion) স্থাপিত হইয়াছে। এই পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে শারীরিক শিক্ষা ও চিত্ত-বিনোদনের কি ব্যবস্থা আছে, তাহা পর্যালোচনা করা হইয়াছে। যৌগিক পদ্ধতি দ্বারা শারীরিক উন্নতি সম্ভব বলিয়া সরকার হইতে যৌগিক পদ্ধতির প্রচারের জন্য অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। Advisory Boardএর পরামর্শ অনুযায়ী গোয়ালিয়রে Lakshmibai College of Physical Education স্থাপিত হইয়াছে। এখানে তিন বৎসরের Degree Course পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। Bharat Scouts and Guidesকে সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করা হয় যাহাতে ইহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে এবং যাহাতে ভারতের Scoutরা আন্তর্জাতিক Jamboreeতে যোগদান করিতে পারে। খেলাধূলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে উপদেশ দিবার জন্য ১৯৫৪ সালে অখিল ভারতীয় ক্রীড়া সংসদ (All India Council of Sports) গঠন করা হইয়াছে। এই সংসদ কতকগুলি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং তাহার কিছু কিছু কার্যেও পরিণত হইয়াছে ; যেমন—শিক্ষা-শিবির স্থাপন, পাঠ্যসূচী রচনা, অতিথিশালা স্থাপন ইত্যাদি। যুবকেরা যাহাতে গ্রাম্য জীবনের সমস্যাগুলির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে শ্রমের মর্যাদা-জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য শ্রম ও সমাজ-সেবা শিবির (Labour and Social Service Camps) পরিচালনা করা হয়। সাঁতার দিবার জন্য জলাশয় খনন এবং খোলা জায়গায় অভিনয়-স্থান রচনা করিবার কাজ সম্বন্ধেও এই Council পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা জাতীয় পরিষদ্ (National Council of Higher Education in Rural Areas) :

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের সভ্যতাকে গ্রামীণ সভ্যতা বলা যাইতে পারে। শিক্ষার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

ভারতে অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ১৬ জন মাত্র। শহর অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার খুব কম বলা যায় না, কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার মোটেই হয় নাই। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা না করিলে ভারতের উন্নতি সম্ভব হইবে না। গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা পরিষদ্ (National Council of Higher Education in Rural Areas) গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ্ গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দিবেন। পরিষদ্ এ পর্যন্ত ১০টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে গ্রাম্য উচ্চ শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নিম্ন প্রকার পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হইয়াছে :—

(১) গ্রামীণ বিজ্ঞানে তিন বৎসরের পাঠ্যক্রম ; (২) কৃষি-বিজ্ঞানে দুই বৎসরের certificate course ; (৩) বেসামরিক গ্রাম্য engineeringএর তিন বৎসরের certificate course ; (৪) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তিন বৎসরের Degree Courseএর উপযুক্ত করিয়া তুলিবার প্রাথমিক পাঠ্যক্রম।

বিদেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ (Cultural Relations with Foreign Countries) :

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বৈদেশিক নীতির জন্য সারা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভারতের মর্যাদার আসন। তাই বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইয়াছে। ১৯৫০ সালে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পরিষদ্ (Indian Council of Cultural Relations) স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদের চেষ্টায় বিদেশের সহিত অধ্যাপক বিনিময় হইতেছে। ভারতীয় ঐতিহ্য অবলম্বনে লিখিত পুস্তক ও ভারতীয় ছবি বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বিদেশ হইতে বড় বড় লোকদের ভারতে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়। International Students' Home নামে একটি

প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে গড়িয়া উঠিয়াছে ; এখানে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনুরাগী দেশীয় ও বিদেশীয় ছাত্রদের থাকিবার স্থান দেওয়া হয়। UNESCO-এর সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য National Commission স্থাপিত হইয়াছে ১৯৫০ সালে। ইহার অধীনে তিনটি Sub-Commission আছে—(১) শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞান সাব-কমিশন (Education and Social Science Sub-Commission); (২) ভাবের আদান-প্রদান (Communication Sub-Commission ; (৩) বিজ্ঞান (Science Sub-Commission)। UNESCO হইতে এই Commissionকে নানা রকম তথ্য ও পুস্তিকা দেওয়া হয়। UNESCO-এর সহযোগিতায় নানা রকম শিক্ষা-শিবির (Seminar) পরিচালনা করেন এই কমিশন। সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় প্রভৃতি চারুকলার বিকাশের জন্য Academy of Dance, Drama and Music, Academy of Letters এবং Academy of Art নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে National Gallery of Modern Art স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ১৮৫৭ সালের পর হইতে ভারতের চারুকলার প্রদর্শনী স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এবং অতীতে যে সকল বিখ্যাত চিত্র ছিল সেগুলি সঞ্চয় করিবার জন্য একটি National Art Treasure Fund খোলা হইয়াছে।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি (Scholarships for Studies abroad) :

ভারতের শিক্ষার মান উন্নয়ন করিবার জন্য ভারত সরকার বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তি দান করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের বৃত্তি দিয়া বিদেশে পাঠানো হইতেছে, যাহাতে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেশে শিক্ষা ও নিরীক্ষার (research) মান উন্নয়ন করিতে পারেন।

রুশীয়, চীনা, স্পেনীয়, ফরাসী, জার্মানী, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য ভারত সরকার হইতে প্রতি বৎসর কতকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। পরলোকগতা কুমারী আগাথা হ্যারিসনের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে অক্সফোর্ডে এশিয়ার সমস্যাগুলির সম্পর্কে অধ্যয়ন করিবার জন্য কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে ২০টি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যে সকল বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক নিজ ব্যয়ে বিদেশের নিরীক্ষণ-কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে ইচ্ছুক, সরকার তাঁহাদের আংশিক ব্যয় বহন করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি বৎসর Commonwealth দেশগুলিতে শিক্ষার্থী প্রেরণের ব্যবস্থাও সরকার কর্তৃক চালু করা হইয়াছে। সমাজ-কল্যাণ কাজে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কতকগুলি শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠানোর ব্যয় বহন করেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N.)। শিক্ষা-দপ্তরের যুব-কল্যাণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা বিভাগ (Youth Welfare and Physical Education Section) প্রতি বৎসর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া যুব উৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুবকদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় যাহাতে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা হয়, তাহার জন্য কতকগুলি যুব-আবাস (Youth Hostel) স্থাপন করা হইয়াছে।

ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের পরিসংখ্যান (Educational Statistics) :

১৯৫১ সালে যে আদম-সুমারী হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ভারতে ৩৬ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৬ কোটি অর্থাৎ শতকরা ১৬·৬ জন লোক চিঠি পড়িতে ও লিখিতে পারে। ৫ কোটির উপর লোকের বিদ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মানের উপর নহে। মাত্র ৩৮ লক্ষ লোক প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সারা ভারতবর্ষে বারো

লক্ষেরও কম সংখ্যক লোক কোন রকম উপাধি লাভ করিয়াছে। শিক্ষিতের হার আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে কম। শতকরা ২৪'৯ জন পুরুষ এবং শতকরা ৭'৯ জন স্ত্রী মাত্র লেখাপড়া জানে।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দেশের সম্পদ যাহাতে ভালভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশন ১৯৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার কাল হইতেছে ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, প্রথম পরি-কল্পনাকালে ২,০৬৯ কোটি টাকা খরচ হইবে কিন্তু পরে ইহার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং খরচের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়া ২,৩৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জাতির জীবনের মান উন্নয়ন করা এবং দেশবাসীর জীবনে নানারকম সুযোগ-সুবিধা দান করা। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে দেশে ধন ও জন সম্পদ কাজে লাগাইতে হইবে এবং দেশবাসীর আয় ও ধন-সম্পত্তির বৈষম্য দূর করিতে হইবে। পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে দেশবাসীর কর্ম-সংস্থান, শিক্ষা-বিস্তার ও রোগমুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গত ৫০ বৎসরে ভারতের জন-সংখ্যা শতকরা ৫২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ে নাই। দেশের লোকের খাইবার জন্য যথেষ্ট খাদ্য নাই এবং বাস করিবার গৃহের অভাবও কম নহে।

দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম বাড়িয়াছে কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। দেশবাসীর জীবনের মান উন্নয়ন করিতে হইলে কৃষি ও শিল্প উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কৃষি ও শিল্প এই দুই বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে অধিকসংখ্যক লোকের চাকুরির সংস্থান হইতে পারে।

পরিকল্পনার অর্থ-সংগ্রহ (Finance):

পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে যে টাকার দরকার, তাহা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? রাজস্ব-খাতে প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৩০ কোটি টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। বাজেটে উন্নয়ন-খাতে কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়। সাধারণের নিকট হইতে দীর্ঘ মেয়াদে ধার লওয়া হয়। জনসাধারণের অল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা হইতে কিছু অর্থ আসে এবং রেলওয়ের উন্নয়ন তহবিল হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মোট ৬৪১ কোটি টাকা আসিবে, ইহাই স্থির হইয়াছিল। এই সঙ্গে আশা করা গিয়াছিল যে, রাজ্য সরকারগুলি ৪৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বরাদ্দ টাকা উঠিলেও ৩৭২ কোটি টাকা ঘাট্‌তি পড়ে। আমেরিকা খাদ্য বাবদে ভারতকে যে টাকা ঋণ দিয়াছে, তাহাও উন্নয়ন-খাতে খরচ করা হইয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষকে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। স্থির হয় যে, প্রয়োজন হইলে গচ্ছিত স্টার্লিং হইতে ২৯০ কোটি টাকা লওয়া যাইতে পারে।

বৈদেশিক মূলধন (Foreign Capital):

পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার প্রয়োজনীয় টাকা দেশ হইতে সঞ্চিত না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বৈদেশিক মূলধন যাহাতে এদেশে আসে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে খরচের মোটামুটি তালিকা :

কৃষি ও সমাজ পরিকল্পনা		—	৩৫৭ কোটি টাকা
সেচ ও বিদ্যুৎ	"	—	৬৬৩ " "
শিল্প ও খনি	"	—	১৭৯ " "
সমাজ-সেবা	"	—	৫৩৩ " "
খাল খনন	"	—	৫৫৭ " "
অন্যান্য	"	—	৬৯ " "
			২,৩৫৮ কোটি টাকা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। যদিও পাঁচ বৎসরে ২,৩৫৮ কোটি টাকা খরচ হইবার কথা ছিল, আসলে খরচ হইল ১,৯৬০ কোটি টাকা। যুদ্ধ ও দেশ-বিভাগের জন্য দেশে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সেইগুলি দূর করাই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। পরিকল্পনা কমিশন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে জীবনের মান উন্নত হয়। সব দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে অনেক দিকে উন্নতি হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়াছে। জন-পিছু আয় পাঁচ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৩ হইতে ২৮১ কোটি টাকা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষির উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। কৃষির উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৩৫৪ কোটি টাকা। কিন্তু আসলে খরচ হইয়াছে ২৯৯ কোটি টাকা। পরিকল্পনা সুরু হইবার সময় ভারতে ৫৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত। পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল

৬১৯ লক্ষ টন। কিন্তু আসলে ৬৪৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমি সেচ-ব্যবস্থার ফলে কৃষিকার্যের উপযোগী করা হইয়াছে এবং আরও ১ কোটি একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সার ও ভাল বীজ বিতরণের জন্য এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র প্রসারিত হওয়ার ফলে কৃষির উৎপাদন দিন দিন অধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বেসরকারী তরফ হইতে শিল্পে মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানার কাজ প্রথম পরিকল্পনাকালের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি বৈদ্যুতিক জিনিস উৎপন্ন করিবার কারখানাও এই সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কয়েকটি বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মোটের উপর প্রথম পরিকল্পনাকালে কাজ ভালই হইয়াছে।

এখন দেখা যাক, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কি উন্নতি হইয়াছে।

(১) **কৃষি** (Agriculture)—কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে প্রথম পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল। কৃষির জন্য বরাদ্দ হইয়াছিল ৩৫৪ কোটি টাকা, কিন্তু খরচ হইয়াছে ২৯৯ কোটি। পরি-কল্পনা সুরু হইবার সময় এদেশে ৫৪০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হইত ; পরিকল্পনা-কালে ইহাকে বাড়াইয়া ৬১৯ লক্ষ টন করার কথা ছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হইয়াছে ৬৪৯ লক্ষ টন।

(২) **যানবাহন**—প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, মোট খরচের শতকরা ২৯ ভাগ যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত হইবে ; কিন্তু আসলে খরচ হইল শতকরা ২৬ ভাগ অর্থাৎ ৫২৫ কোটি টাকা।

(৩) **উন্নয়ন পরিকল্পনা** (Community Projects)—প্রথম পরিকল্পনা

কালের শেষে দেখা যায় যে, C. D. বা N. E. S. Blockএর আওতায় আসিয়াছে ১, ৪০,০০০ গ্রাম এবং প্রায় ৮ কোটি লোক ইহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। প্রথমে এই বাবদে ৯০ কোটি টাকা খরচ হইবার কথা ছিল ; কিন্তু আসলে খরচ হইয়াছে ৪৬ কোটি।

(৪) **শিল্প** (Industry)—শিল্পে মোট খরচ হইয়াছে ১,০০০ কোটি টাকা —যদিও প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, এ বিষয়ে মাত্র ১৮৮ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। ১৯৫১ সালের সহিত তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩৮ ভাগ। গ্রামে ছোট ছোট শিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্য যাহা আশা করা গিয়াছিল, তাহা হয় নাই।

(৫) **শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা** (Education and Scientific Research)—শিক্ষার জন্য ১৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল কিন্তু খরচ হইয়াছে ১৫৩ কোটি টাকা। খরচের অনুপাতে শিক্ষার প্রসার যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। জন-শিক্ষার কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই বলিলেই হয়।

(৬) **স্বাস্থ্য** (Health)—ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিবার অভিযান অনেকটা সাফল্যপূর্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। দেশের প্রয়োজনমতো ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

(৭) **কর্ম-সংস্থান** (Employment)—বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে বেকারের সমস্যা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কিছু কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনধারণের মান এখনও পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহের মধ্যে ভারতেই সর্বাপেক্ষা নীচে। সাধারণ ভারতবাসী যে খাদ্য খায়, তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। যুদ্ধের পূর্বে জন-প্রতি যে কাপড় ব্যবহার করা হইত, তাহাই রহিয়া

গিয়াছে। উপযুক্ত গৃহের অভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে জন্মের হার যে খুব বেশী, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যে হারে জন্ম-সংখ্যা বাড়িতেছে, সেই হারে দেশের সম্পদ বাড়িতেছে না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Second Five Year Plan):

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতি সাধন করা। ১৯৫৬ সালে স্বরু হইয়াছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজকে গড়িয়া তুলিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে তাহাই প্রথমে বাড়াইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য মোটামুটিভাবে বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় :—

(১) জাতীয় আয় গড়ে শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ানো যাহাতে জীবনের মান উন্নত করা যায়।

(২) বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের দ্রুত শিল্পায়ন।

(৩) কর্ম-সংস্থানের স্বযোগ বৃদ্ধি করিয়া বেকার সমস্যা দূর করা।

(৪) আয় ও ধন-সম্পদের বৈষম্য দূর করিয়া দেশের লোকের অর্থ-নৈতিক অবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে প্রথম পরিকল্পনার সম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও দেশ-বিভাগ জনিত কতকগুলি বিশেষ সমস্যার সমাধান করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য একই থাকিলেও শিল্পায়-করণের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় শিল্পের সঙ্গে সঙ্গেই কুটিরশিল্প ও মাঝামাঝি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্যও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (The Plan in brief) ঃ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য হইতেছে, পাঁচ বৎসরে জাতির আয় শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ানো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক কর্ম-সংস্থান করা এবং দেশের শিল্পের উন্নতি করা।

পরিকল্পনার ব্যয় (Plan outlay)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অংশ লইয়া মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা খরচ হইবে। এই টাকা নিম্নলিখিত-ভাবে খরচ হইবে ঃ—

১। কৃষি ও উন্নয়ন ব্লক	—	৫৬৮	কোটি টাকা
২। জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	—	৯১৩	,, ,,
৩। শিল্প ও খনি	—	৮৯০	,, ,,
৪। যানবাহন ও পথঘাট	—	১,৩৮৫	,, ,,
৫। সমাজ-সেবা	—	৯৪৫	,, ,,
(ক) শিক্ষা	—	৩০৭	,, ,,
(খ) স্বাস্থ্য	—	২৭৪	,, ,,
(গ) গৃহ-নির্মাণ	—	১২০	,, ,,
(ঘ) অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি	—	৯১	,, ,,
(ঙ) সমাজ উন্নয়ন	—	২৯	,, ,,
(চ) শ্রম ও শ্রমিকের উন্নতি	—	২৯	,, ,,
(ছ) পুনর্বাসন	—	৯০	,, ,,
(জ) শিক্ষিত বেকার সমস্যা দূরীকরণ	—	৫	,, ,,
৬। বিবিধ	—	৯৯	কোটি টাকা
মোট	—	৪,৮০০	কোটি টাকা

উপরে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে খরচের তালিকা দেওয়া হইল, তাহার

মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের দান (অর্থ ও দ্রব্য) ধরাই না হয়। বিভিন্ন খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সব খাতে সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় সমস্ত খরচের শতকরা ৮ ভাগ শিল্প ও খনির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল ; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে শিল্প ও খনির উন্নতির জন্য বরাদ্দ হইয়াছে শতকরা ১৯ ভাগ টাকা। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শিল্পের জন্য মোট ৮৯০ কোটি বরাদ্দ টাকার মধ্যে ৬৯০ কোটি টাকাই রাখা হইয়াছে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের জন্য এবং মাত্র ২০০ শত কোটি টাকা ধরা হইয়াছে ছোট ছোট কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি ঃ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের (১৯৫৬-৫৭) শেষে কাজ কতটা আগাইয়াছে পরিকল্পনা কমিশন তাহা আলোচনা করিয়া যে বিবরণী পেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

কৃষিকার্য—দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টন বাড়িবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, ১৯৫৫-৫৬ সালে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে যেখানে ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৬ কোটি ৬২ লক্ষ টন। ধান ও গমের উৎপাদন যদিও সামান্য বাড়িয়াছে, অন্যান্য শস্যের উৎপাদন মোটেই বাড়ে নাই বরং ডালের উৎপাদন কমিয়াছে। কিন্তু তৈলবীজ, কার্পাস ও আখের উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে ২৪ একর করিয়া বিস্তৃত ৪৭৫টি বীজাগার স্থাপন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। যেখানে ২ কোটি একর জমিতে জাপানী প্রথায় চাষ করিবার কথা ছিল, সেখানে মাত্র ১ কোটি ৪৫ লক্ষ একর

জমিতে এই প্রথায় চাষ হইয়াছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে ট্র্যাক্‌টারের সাহায্যে ১৫ লক্ষ পতিত জমি জলসেচনের দ্বারা আবাদের উপযুক্ত করা হইয়াছে।

সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা—১৯৫৬-৫৭ সালে বড় বড় কৃত্রিম খালের দ্বারা ১ কোটি ৬০ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ছোট ছোট সেচ খালের দ্বারা আরও ১৬ লক্ষ একর জমিতে চাষের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ছোট-বড় প্রায় ৯০টি সেচ খাল খনন করা হইয়াছে। ছোট শহর ও পল্লীগ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের মধ্যেই ২,০০০ ছোট শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আজ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে মোট ৯,৫০০ শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে।

শিল্পোন্নতি—সমস্ত চালু বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুটিরশিল্পের উৎপাদনও বাড়িয়াছে। যেখানে ১৯৫৫ সালে তাঁতে ১,৪৭৩ মিলিয়ন গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল, সেখানে ১৯৫৬ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১,৫৪১ মিলিয়ন গজে দাঁড়ায়। খদ্দরের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯৫৭ সালের শেষে ৬০,০০০ হাজার অম্বর চরকা প্রবর্তন করা হইয়াছে দেখা যায়। কুটিরশিল্প বিশেষভাবে প্রবর্তন করিবার জন্য ১৫টি নূতন স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বৃহৎ শিল্পের সহকারী হিসাবে কতকগুলি কুটির-শিল্প আরম্ভ করার জন্য ১০টি শিল্প-নগরীর স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

যানবাহনের উন্নতি—১৯৫৬-৫৭ সালের শেষে ৮৭ মাইল নূতন রেলপথে যাত্রী ও মাল চলাচল আরম্ভ হইয়াছে এবং ৫২৪ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণের কাজ সুরু হইয়াছে। বর্তমান রেল কারখানাগুলির পরিবর্ধন ও উন্নতি সাধন করা হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব-সময়ে চালু (all weather) রাস্তা ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে আরও কয়েকটি ভাল রাস্তা তৈয়ারি করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের খরচ ঃ

১৯৫৬-৫৭ সালে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে মোট খরচ হইয়াছে ৭৬১ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে ৩৭০ কোটি টাকা দিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং ৩৯১ কোটি টাকা দিয়াছেন রাজ্য সরকার। বিভিন্ন খাতে খরচ হইয়াছে নিম্ন প্রকার ঃ—

১।	কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	...	৯৩ কোটি টাকা
২।	সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	...	১৭৯ " "
৩।	শিল্প ও খনি	...	১১১ " "
৪।	যানবাহন	...	২৩৩ " "
৫।	সমাজ-সেবা	...	১২৩ " "
৬।	বিবিধ	...	২২ " "

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শিক্ষার অবস্থা ঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-খাতে ১৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৪৪ কোটি টাকা কেন্দ্রে ও ১২৫ কোটি টাকা রাজ্যে খরচ হইবে স্থির ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ৩০৭ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে কেন্দ্রের জন্য ৯৫ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য ২১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

		প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
প্রাথমিক শিক্ষা	...	৯৩ কোটি টাকা	৮৯ কোটি টাকা
মাধ্যমিক শিক্ষা	...	২২ " "	৫১ " "
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা	...	১৫ " "	৫৭ " "
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	...	২৩ " "	৪৮ " "
সামাজিক শিক্ষা	...	৫ " "	৫ " "
পরিচালন সংস্থা ও বিবিধ	...	১১ " "	৫৭ " "
		১৬৯ কোটি টাকা	৩০৭ কোটি টাকা

পূর্বপৃষ্ঠায় যে ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব দেওয়া হইল, তাহা ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমাজ-শিক্ষা খাতে উন্নয়ন বিভাগ হইতে যথাক্রমে ১২ কোটি ও ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে প্রথম পরিকল্পনায় কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যই বা কি।

বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দান :

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
১। ছাত্র—			
(ক) ৬—১১ বৎসর বয়স	১,৮৬,৮০,০০০	২,৪৮,১২,০০০	৩,২৫,৪০,০০০
শতকরা হিসাব	৪২%	৫২%	৬২·৭%
(খ) ১১—১৪ বৎসর বয়স	৩৩,৭০,০০০	৫০,৯৫,০০০	৬৩,৮৭,০০০
শতকরা হিসাব	১৩·৯%	১৯·২%	২২·৫%
(গ) ১৪—১৭ বৎসর বয়স	১৪,৫০,০০০	২৩,০৩,০০০	৩০,৭০,০০০
শতকরা হিসাব	৬·৪%	৯·৪%	১১·৭%
২। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—			
(ক) প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়	২,০৯,৬৭১	২,৭৪,০৩৮	৩,২৬,৮০০
(খ) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১,৪০০	৮,৩৬০	৩৩,৮০০
(গ) মধ্য (উচ্চ বুনিয়াদী) বিদ্যালয়	১৩,৫৯৬	১৯,২৭০	২২,৭২৫
(ঘ) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৩৫১	১,০৪৫	৪,৫৭১
(ঙ) উচ্চ/উচ্চতর বিদ্যালয়	৭,২৮৮	১০,৬০০	১২,১২৫
(চ) বহুমুখী বিদ্যালয়	—	২৫০	১,১৮৭
(ছ) উচ্চ বিদ্যালয় যেগুলিকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নত করা যাইবে		৪৭	১,১৯৭
(জ) বিশ্ববিদ্যালয়	২৬	৩১	৩৮

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
৩। ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering)—			
(ক) উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র	১,৭০০	৩,০০০	৫,৪৮০
(খ) ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ছাত্র	২,১৪৬	৩,৫০০	৩,০০০
৪। কারিগরী (Technology)—			
(ক) ডিগ্রী-প্রাপ্ত ছাত্র	৪৯৮	৭০০	৮০০
(খ) ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ছাত্র	৩৩২.	৪৩০	৪৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুব-সংস্থা (Youth Organisation)

ভারত যতদিন পরাধীন ছিল, ততদিন বিদেশী সরকার আমাদের দেশের যুবকদের দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টিপাত করেন নাই ; বরং তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতি উদাসীনতাই দেখানো হইত। যুবকদের সংগঠন-ক্ষমতা, নেতৃত্ব-শক্তি, জনপ্রিয়তা দেখা গেলেই তাহারা সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া নানা রকমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইত।

দেশ স্বাধীন হইবার পর আমাদের জাতীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী গিয়াছে বদলাইয়া। যুবকদের যাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তাহাদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায়, দেশের সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত হইয়া কাজে আগাইয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(ক) **যুব-কল্যাণ সমিতি** (Youth Welfare Samity)—প্রত্যেক জেলায় শারীরিক শিক্ষা ও যুব-কল্যাণ দেখিবার জন্য একজন করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং পল্লীতে ক্লাব (club) স্থাপন করিতে সাহায্য করেন জেলা শারীরিক শিক্ষাধিকর্তা। এই সকল

clubএ নানারকম খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। এই সকল clubএ গ্রাম ও শহরের যুবকেরা অবসর সময়ে মিলিত হইয়া নানা রকম খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে।

কথায় বলে—Man cannot live by bread alone. যুবকেরা যাহাতে পড়াশুনা করার সুযোগ পায় এবং নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য পুস্তকাগার স্থাপন করা হইতেছে এবং চালু পুস্তকাগারে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। Youth Club এবং বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রে রেডিও দেওয়া হইতেছে। যাত্রা, থিয়েটার, কবির গান, গম্ভীরা গান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে সরকার অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করিয়া শিক্ষা ও আনন্দ দানে সহায়তা করিতেছেন।

ভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিলে এবং বিভিন্ন লোকের সহিত মিশিলে মনের সংকীর্ণতা দূর হয় এবং প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার গতি রুদ্ধ হয়। এইজন্য এখন যুবকদের excursion, hiking প্রভৃতির উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। দলবদ্ধভাবে excursionএ গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের রেলওয়ে সুবিধা (concession) দেওয়া হইতেছে। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানে গিয়া যুবকদের যাহাতে থাকা-খাওয়ার অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে Youth Hostel খোলা হইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের একত্রে মিলিত হইবার এবং আঞ্চলিক ভাবধারা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ দিবার জন্য প্রতি বৎসর দিল্লীতে একটি করিয়া যুব-উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। এই যুব সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। ভারতের বাহিরে কোন

স্থানে যুব-উৎসব উদ্‌যাপিত হইলে সরকার হইতে ব্যয় বহন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কিছুদিন পূর্বে রাশিয়াতে যে যুব-উৎসব হইয়াছিল, সেখানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারী ব্যয়ে একদল ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠানো হইয়াছিল।

ভারতের সভ্যতাকে গ্রামীণ সভ্যতা বলা হয়। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন পল্লী অঞ্চলে বাস করে। পল্লীর উন্নতির উপর নির্ভর করে ভারতের উন্নতি। যুবকেরা যাহাতে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং নিজ হাতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবার সুযোগ পায়, তাহার জন্য প্রতি বৎসর দেশের নানাস্থানে যুব-শিবির (Youth Camp) পরিচালনা করা হয়। এই যুব-শিবির সরকার ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত হয়। সাধারণতঃ এই শিবির পল্লী অঞ্চলে হয় এবং তিন সপ্তাহ হইতে এক মাস ধরিয়া এই শিবির চলে। এই শিবিরে সম্মিলিত যুবকদের নানা বিষয়ে সেই অঞ্চলের বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা ও উপদেশ দেন। তাহা ছাড়া শিবিরে যোগদানকারী যুবকেরা গ্রামের লোকদের সহিত মিলিতভাবে রাস্তা তৈয়ারি করা, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা, পুকুর কাটা প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করে। প্রতি সন্ধ্যায় শিবিরে যে আনন্দোৎসব হয়, সেখানে শিবিরে যোগদানকারী যুবকেরা ও গ্রামের লোকেরা একসঙ্গে মিলিত হয়, এবং ভাবের আদান-প্রদান হয়।

গ্রাম সেবকদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই ২।১টি করিয়া জনতা মহাবিদ্যালয় (Janata College) স্থাপিত হইয়াছে।

স্ত্রী ও শিশু সংস্থা ঃ

ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিলে দেখা যায়, পুরাকালে কোন কোন দেশে ২।৪ জন মহিলা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং পুরুষের সমকক্ষ বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন। তথাপি মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে, মেয়েদের গৃহাভ্যন্তরে

আবদ্ধ করিয়া পুরুষের অধীনস্থ জীবরূপেই গণ্য করা হইত। সন্তানের জন্মদান ও সন্তান-পালনই তাহাদের একমাত্র কাজ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল।

মানুষ যখন ছিল শিকারী এবং বনে বনে পশু শিকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন মেয়েরা থাকিত গুহাভ্যন্তরে। তাহাদের কাজ ছিল শিকার-করিয়া-আনা জীবজন্তুর ছাল ছাড়ানো, খাবার তৈয়ারি করা, কাঠ সংগ্রহ করা এবং শিশু পালন করা। সভ্যতার দ্বিতীয় ধাপে মানুষ যখন যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিল এবং গৃহপালিত জীবজন্তু লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে লাগিল, তখনও কিন্তু মেয়েদের অবস্থার উন্নতি হইল না। মেয়েরা তখন গৃহপালিত পশু দেখাশুনা করিত। তাহার পর মানুষ যখন এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া কৃষিকার্য স্থুরু করিল, তখন মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে বীজ বপন ও চারা গাছ বসানোর কাজে বাড়ীর লোকদের সাহায্য করিবার জন্য বাহির হইল। আদিযুগে মেয়েরা গৃহকোণে বসিয়া নিভৃতে ঘর-সংসার করিল, রান্না করিল এবং স্বামী-পুত্রের স্থখ-স্থবিধা দেখিল; কিন্তু কবি বা দার্শনিকের দৃষ্টি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল না।

আদিম যুগ কাটিয়া গেল। মধ্যযুগ আসিল, কিন্তু মেয়েরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকিয়া গেল। তাই Havelock Elles বলিয়াছেন—"যখন আমরা মধ্য-ভারতীয় সাহিত্যের দিকে তাকাই, তখনই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছে, এ দৃষ্টান্ত একটিও দেখিতে পাই না। মেয়েদের কখনো করা হইয়াছে খেলার পুতুল, আবার কখনো ঠাকুরের ন্যায় পূজা করা হইয়াছে।" মধ্যযুগীয় নাইট্‌রা তাহাদের প্রেমিকাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য তরবারি উন্মুক্ত করিতে সদাই প্রস্তুত; কিন্তু দরিদ্র কৃষক বালিকাদের প্রতি কোন সৌজন্য দেখাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

আমেরিকা, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার হইল; বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় পোত বাহির হইল এবং শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে

সঙ্গে নূতন নূতন কারখানা খোলা হইল। কিন্তু মেয়েদের বোঝা কিছুমাত্র কমিল না। ১৭৯২ সালে শ্রীমতী উলস্টোনক্রাস্ট সর্বপ্রথম মেয়েদের স্বাধীনতার কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন—"মেয়েদের খেলার পুতুলের মত ব্যবহার করো না; তাদের মানুষ ব'লে মনে করো এবং মানুষের মতই তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করো।"

মানব স্বাধীনতার বাণী প্রচারক রুশোর মত লোকও লিখিয়াছেন—"মেয়েদের শিক্ষা পুরুষের প্রয়োজনের তাগিদেই চালিত হইবে। আমাদের (পুরুষদের) সন্তুষ্ট করা, কাজে লাগা, আমরা যাহাতে তাহাদের ভালবাসিতে ও সম্মান দেখাইতে পারি নিজেদের সেইরূপ ভাবে তৈয়ারি হওয়া, ছোট-বেলায় ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া, পূর্ণবয়স্কদের যত্ন করা, পুরুষদের সান্ত্বনা ও উপদেশ দেওয়া এবং পুরুষের জীবন সুখময় করাই মেয়েদের কর্তব্য।" ৫০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বিবাহই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করা হইত। ইংলণ্ডে Mrs Browning, George Eliot, Mrs Gaskel Harreit Martineau প্রভৃতি বিদুষী মহিলা তাঁহাদের লেখনীর সাহায্যে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। Florence Nightingale ত্যাগ ও সেবার মহৎ আদর্শ মেয়েদের সম্মুখে ধরিলেন। পুরুষদের মধ্যে John Stuart Mill সর্বপ্রথম বলিলেন,—"আইনতঃ স্ত্রী পুরুষের অধীনে থাকিবে ইহা অন্যায় এবং ইহাতে সমাজের উন্নতি ব্যাহত হয়। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের থাকিবে সমান অধিকার।" ইংলণ্ড ও পশ্চিমের সভ্য দেশগুলিতে আজ মেয়েদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের নারীদের অবস্থা তাহাদের পশ্চিমের ভগিনীদের অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না। গার্গী, লীলাবতী প্রভৃতি কয়েকটি বিদুষী মহিলার পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশেও মেয়েদের আমরা ঘরের কোণে আটকাইয়া রাখিয়া 'স্বামীর সেবাই পরম ধর্ম' একথা প্রচার করিয়াছিলাম। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের

প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের চেষ্টায় ভারতে মেয়েদের অনেক অসুবিধা দূর করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধানে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের পুরুষের মতই ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নারীরা আজ সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের মতো কৃতিত্বের সহিত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যে রত আছে।

মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় সমাজ অনুভব করিয়াছে। মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করা হইতেছে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ বা ছেলেদের কলেজেই মেয়েদের পড়িবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আজ ভারতীয় নারী রাষ্ট্রদূত হইয়াছেন, রাজ্যপালদের মধ্যেও ভারতীয় নারী আছেন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আইনসভা ও আইন পরিষদে যোগদান করিয়া ভারতীয় নারীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। All India Women's Conference, Women's League, Women's Protection League, Y. W. C. A. প্রভৃতি সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় নারীদের এবং দেশের মঙ্গলের জন্য এই সকল সংস্থা প্রশংসনীয় কাজ করিতেছেন। All India Women's Conference অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং সমাজ-সেবার কাজের জন্য দেশের সর্বত্র ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। কাতাই, বুনাই, সেলাই ও অন্যান্য কুটির-শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এবং গ্রামের অশিক্ষিত মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও All India W. Conference করিতেছেন। Women's League এবং Women's Protection League এই দুইটি সংস্থাও মহিলাদের স্বার্থ-রক্ষা ও উন্নতির জন্য কাজ করিতেছেন। Y. W. C. A. একটি সুপরিচিত সংস্থা। সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া ইহার শাখা রহিয়াছে। সাধারণভাবে মেয়েদের এবং বিশেষ করিয়া খ্রীষ্টীয় সমাজের জন্য অনেক হিতকর কাজ এই সংস্থার কৃতিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

পুরুষ ও নারী মিলিয়া সমাজ। সমাজ বা দেশের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে মেয়েদের পুরুষের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। ভারত সরকার দেশের উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা সার্থক করিতে হইলে ঘরে ও বাহিরে এবং দেশে ও বিদেশে মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। গৃহে মেয়েদের প্রধান কাজ হইতেছে শিশুদের স্বাধীন দেশের উপযোগী নাগরিক গঠন করা। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম—শতকরা ১০ জনেরও কম। পল্লী অঞ্চলে যেখানে দেশের বেশীর ভাগ লোক বাস করে, সেখানেই শিক্ষিতা স্ত্রীর সংখ্যা আরও কম। আমাদের দেশের যে সকল নারী শিক্ষার আলোক পাইয়াছেন, তাঁহাদের উচিত ভাগ্যহীনা ভগিনীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রের মারফতে সমাজ-শিক্ষা বিভাগ হইতে অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত ও উৎসাহশীলা শিক্ষিকার অভাবে যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে Community Centre স্থাপিত হইয়াছে। এই Community Centreএর মহিলা কর্মিগণ গ্রামের মহিলাদের সাধারণ শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহা ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যসূচীতেও মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সকালে ছোট শিশুদের পড়ার ব্যবস্থা করা হইবে, দুপুর বেলায় গ্রামের মহিলারা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সমবেত হইবেন। সেখানে তাঁহাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া, সংবাদপত্রের বিশিষ্ট অংশগুলি পাঠ করিয়া শুনানো হইবে এবং সূতা কাটা, সূচিশিল্প বা সেলাই-এর কাজও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশে মহিলাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য সরকার বিভিন্ন বিভাগ খুলিয়াছেন। All India Women's Conference-ও মহিলাদের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষে All India

Women's Conferenceএর ৩৭টি শাখা এবং ৩০০টি উপশাখা আছে। The National Council of Womenএর সারা দেশে ১২টি বড় বড় কেন্দ্র আছে এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে Girls' Guide Association, জাতীয় Y. W. C. A., নৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য সমিতি (Moral and Social Hygiene Association) এবং শিক্ষাপ্রাপ্তা শুশ্রূষাকারিণীদের সমিতি (Trained Nurses Association)। কস্তুরাবা ও গান্ধী স্মারক সমিতি (Kusturba Gandhi Memorial Trust) ১৮টি রাজ্যে গ্রামবাসী মহিলাদের উন্নতির জন্য কাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেশের হাসপাতাল, প্রসূতি-আগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও মেয়েদের মধ্যে অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করার কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে বলা যায় না।

প্রসূতি ও শিশুর যত্ন—আমাদের দেশে প্রসূতি ও শিশুর যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয় না। শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবে কত রমণী যে অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কত শিশু যে জগতে আসিতে আসিতেই বিদায় লয়, তাহার সঠিক হিসাব নাই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে প্রসূতি ও শিশুর চিকিৎসা ও যত্নের জন্য টাকা ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে চালু হাসপাতালের সঙ্গে প্রসূতি ও শিশু চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, প্রতি প্রসূতি ও শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এককালীন ২,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইবে ; কেন্দ্রের বাড়ী-ঘর, আসবাব-পত্র ও যন্ত্রপাতির জন্য এককালীন অবশিষ্ট খরচ রাজ্য সরকার বহন করিবেন। প্রসূতি ও শিশু কেন্দ্রের পৌনঃপুনিক খরচ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে নিম্ন প্রকারে বণ্টন করা হইবে :—

	কেন্দ্রীয় সরকার	রাজ্য সরকার
প্রথম ছয় মাস	১০০%	—
তাহার পর ১২ মাস	৬৬·৬৬%	৩৩·৩৩%
পরে ছয় মাস	৫০%	৫০%

শিশুদের শারীরিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশু বাড়ীতে যে খাবার খায়, তাহা শরীর-গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কাজেই বিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) অনেক শিশু আছে যাহাদের বয়সের তুলনায় মানসিক বৃত্তিগুলি সম্যক্ বিকাশ লাভ করে নাই। এই সকল শিশুর জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। বর্তমানে অপ্রাপ্ত মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

(৩) **শিশু পরিচালনা-কেন্দ্র** (Child Guidance Clinic)—পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিশু-পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য clinic থাকা উচিত। এখানে থাকিবেন একজন শিশু-চিকিৎসক, একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ ও কয়েকজন পরিদর্শিকা। কয়েকটি শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র এবং কয়েকটি প্রগতিশীল বিদ্যালয় ছাড়া দেশে Child Guidance Clinic খুব বেশী সংখ্যায় স্থাপিত হয় নাই।

(৪) যে সকল মাতা কল-কারখানায় কাজ করে, তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্য স্কুল (creche) স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, মায়েরা যখন কল-কারখানায় কাজ করিতে যায়, তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দেখাশুনা করিবার কেহ থাকে না। হয় তাহারা থাকে বড় ভাই-বোনেদের তত্ত্বাবধানে কিংবা নিজেরাই ধূলা-কাদায় খেলিয়া বেড়ায়। পশ্চিমের প্রগতিশীল দেশগুলিতে দেখা যায়,

প্রত্যেক শহরেই কতকগুলি শিশু-প্রতিষ্ঠান (creche) আছে—যেখানে মায়েরা কাজ করিতে যাইবার সময় ছোট ছেলেদের রাখিয়া যায় এবং কাজ করিয়া ফিরিবার সময় আবার তাহাদের লইয়া যায়। আমাদের দেশে Bata, Dunlop, Tata প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানির কর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্য ২।১টি creche স্থাপিত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে যেখানে মেয়েদের সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের অযত্নের চূড়ান্ত হয়। আবার শহর অঞ্চলেও আজকাল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের চাকুরি করিতে হয়। সেই সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে বাড়ীর অশিক্ষিত চাকর ও চাকরাণীদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আসিতে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্য creche একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কতকগুলি পূর্ব বুনিয়াদী (pre-basic) স্কুল স্থাপন ছাড়া সরকার এ বিষয়ে বেশী দূর অগ্রসর হন নাই।

(৫) **খেলার মাঠ** (Play Ground)—খেলা শিশুদের অতি প্রিয়। তাহাদের সামগ্রিক বিকাশের জন্যও খেলাধূলার একান্ত প্রয়োজন। শহরে শিশুদের খেলিবার কোন স্থান নাই বলিলেই চলে। কলিকাতার মত বড় বড় শহরে স্থানে স্থানে পার্ক আছে বটে, কিন্তু সেগুলির সংখ্যাও যথেষ্ট নহে এবং তাহা ছেলেমেয়েদের খেলার জন্যই পৃথক করিয়া রাখা হয় নাই। তাহার ফলে স্বাস্থ্যকামী ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ দ্বারাই ব্যায়াম-কেন্দ্র, সাঁতারের ক্লাব ইত্যাদির বেশীর ভাগ স্থান অধিকৃত হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খেলার স্থান বেশী থাকে না। ছোট ছোট শহরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খেলার মাঠের কোন ব্যবস্থাই নাই। এ বিষয়ে মিউনিসি-প্যালিটি ও কর্পোরেশনের দৃষ্টি রাখা উচিত।

(৬) **শিশু-কেন্দ্র** (Children's Centre)—শিশুদের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি এমন কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত যেখানে শিশুদের পড়িবার উপযুক্ত বই, ছবি, Ludo, Carrom প্রভৃতি ঘরে বসিয়া খেলার বা Ping-pong,

Badminton প্রভৃতি অল্প-পরিসর জায়গায় খেলার জিনিস থাকিবে। শিশুরা এখানে আসিয়া খুশিমত খেলাধুলা করিতে এবং ইচ্ছামত বই পড়িতে বা ছবি দেখিতে পারিবে। 'মণিমেলা', 'সব-পেয়েছির আসর' প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থা আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের উদ্যোক্তারা শিশু-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিশুদের আনন্দ ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের কার্য এখনও শহরের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ আছে ; পল্লী অঞ্চলে এখনও ছড়াইয়া পড়ে নাই।

(৭) আমাদের দেশে অনেক ছেলেমেয়ে অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া অশিক্ষায় ও অযত্নে মানুষ হয়। আবার অনেক শিশুকে মাতাপিতা অভাবের তাড়নায় ও সামাজিক লজ্জার ভয়ে ত্যাগ করিয়া যায়। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কাজেই এই সকল শিশুদের ভার সরকারকেই লইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতকগুলি অনাথ আশ্রম (orphanage) স্থাপন করিয়া এই সকল পরিত্যক্ত শিশুদের প্রতিপালনের ভার লইয়াছেন। All India Women's Conference, Save the Children Society প্রভৃতি কতকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও কতকগুলি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করেন।

(৮) অশিক্ষা বা কুশিক্ষার জন্য কতকগুলি ছেলে অল্প বয়সে চুরি, পকেট মারা এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজে প্রবৃত্ত হয়। সাধারণ কয়েদীর মত শাস্তির ব্যবস্থা করিলে এই সকল শিশু-অপরাধীদের অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের যদি বিশেষ কোন স্থানে রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ভবিষ্যতে এই সকল শিশুই সু-নাগরিক হইতে পারে। এই সকল শিশু-অপরাধীদের শিক্ষা দিয়া সু-নাগরিক তৈয়ারি করিবার জন্য সরকার হইতে Borstal School, Reformatory School স্থাপিত হইয়াছে।

শিশু-অপরাধীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোন কোন রাজ্যে

শিশুদের গ্রাম (Children's Village), বালকদের শহর (Boys' Towns) প্রভৃতি সংস্থা গড়িয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক রাজ্যে শিশু-অপরাধীদের সাহায্য সমিতি স্থাপন করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীদের সাহায্য চাহিয়া বিচারালয়ের বাহিরেই শিশু-অপরাধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পারিবারিক পরিকল্পনা (Family Planning) ঃ

প্রতি বৎসর ভারতে গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই পরিমাণে জন-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান যোগাড় করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইবে এবং জাতি হিসাবে ভারতের উন্নতি ব্যাহত হইবে। দেশের জন-সংখ্যা যাহাতে আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় তাহার জন্যই সরকার হইতে পরিবার সংকোচনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ—(১) জনসাধারণকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। (২) বহুসংখ্যক পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ (family planning)-কেন্দ্র খুলিতে হইবে। এখানে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রথা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সাহায্য করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে। (৩) ডাক্তার, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (health visitors), সমাজ-কর্মী (social workers) এবং অন্যান্য কর্মী (field workers) নিযুক্ত করিয়া তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিবার সংকোচন পরিকল্পনাকে রূপ দান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবার নিয়ন্ত্রণ সংসদ (Central Family Planning Board) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ইহার সভাপতি। রাজ্যে এই প্রকার এক-একটি করিয়া সংস্থা স্থাপন করা হইতেছে।

পরিবার সংকোচন পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ৪৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪০০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ৯৭ লক্ষ টাকা রাজ্য

সরকার মারফৎ খরচ হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পল্লী অঞ্চলে ২০০ এবং শহরাঞ্চলে ৫০০ পরিবার সংকোচন-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-কালে সারা ভারতবর্ষে ১৭৪টি Clinic স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মধ্যে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ৬৪টি এবং শহরাঞ্চলে ৮০টি পরিবার সংকোচন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার সংকোচনের কাজে শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। যেমন—(১) বোম্বাই-এ পরিবার সংকোচন নিরীক্ষা-কেন্দ্র (Family Planning Research Centre in Bombay), রমনগ্রামে পরিবার সংকোচন প্রদর্শনী ও নিরীক্ষা-কেন্দ্র (Family Planning Demonstration and Experimental Centre, Ramanagram), কলিকাতায় অখিল ভারত স্বাস্থ্য ও জন-স্বাস্থ্য শিক্ষা-নিকেতন (All India Institute of Hygiene and Public Health in Calcutta)। অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয় শিক্ষার জন্য আরও ৬টি আঞ্চলিক শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

ভারতের পল্লী :

ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ। সমগ্র ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫,৪৪,৬৯২ এবং শহরের সংখ্যা মাত্র ২,৪১৫। সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৮৭ জন থাকে গ্রামে এবং শতকরা মাত্র ১৩ জন শহরে বাস করে। আমাদের দেশের সভ্যতা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমরা দিন দিন ভারতের প্রাণকেন্দ্র পল্লীগুলিকে অবহেলা করিতেছি। শহরগুলির দিন দিন উন্নতি হইতেছে এবং পল্লীগুলি হইতেছে হতশ্রী ও মৃতপ্রায়। আমাদের দেশের উন্নতি করিতে হইলে গ্রামের উন্নতি কিসে হয়, সেই কথাই চিন্তা করিতে হইবে।

এখন দেখা যাক, পল্লীর প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি কি এবং সেগুলির সমাধানের জন্যই বা কি করা যায়।

পল্লীর উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইতেছে অশিক্ষা। সারা ভারতবর্ষে শতকরা ১৬ জনের সামান্য কিছু বেশী সংখ্যক লোক লেখাপড়া জানে। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা আরও কম।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা—পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকেরা স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগ একবার গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, গ্রামের লোকেরা এই সব রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে হয় অজ্ঞ কিংবা জ্ঞান থাকিলেও তাহারা তাহা কাজে লাগাইতে পারে না।

কৃষি ও কুটিরশিল্প বিষয়ে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রথা অবলম্বনে অক্ষমতা—গ্রামের কৃষকেরা মান্ধাতার আমল হইতে একই প্রথায় কৃষিকার্য করিতেছে। সকাল বেলায় গরু ও লাঙ্গল লইয়া মাঠে যায়, সারাদিন কাজ করিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে ক্লান্ত দেহে বিকালে বাড়ী ফিরে। অন্যান্য দেশে কৃষকেরা যেখানে প্রতি বিঘায় ৩০।৪০ মণ শস্য উৎপাদন করে, সেখানে ভারতের কৃষক উৎপাদন করে বিঘা প্রতি মাত্র ৮।১০ মণ ফসল। অন্যান্য দেশে শিল্পীরা উন্নতধরনের যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুতের সাহায্যে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈয়ারি করিয়া কলে-তৈয়ারী জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া আছে। কিন্তু ভারতের শিল্পী তাহার আদিকালের যন্ত্রপাতি লইয়া পুরানো নমুনার জিনিস উৎপন্ন করিয়া যথেষ্ট দামও পাইতেছে না। তাহারা কলের জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া জন-মজুরের কাজে লাগিতেছে।

গ্রামের চাষী ও শিল্পী তাহাদের উৎপন্ন জিনিসের উচিত মূল্য পায় না।

তাহারা সংসারের কোন খবর রাখে না। কোথায় কোন্ জিনিসের কি রকম চাহিদা আছে, তাহা চাষী ও শিল্পীর জানা নাই। তাহা ছাড়া অভাবের সময় গ্রামের চাষী মহাজনের কাছে টাকা দাদন লয়; কাজেই উৎপন্ন শস্য ও শিল্পদ্রব্য তাহাকে অল্প দামে মহাজনের কাছে বিক্রয় করিতে হয়। মহাজন চাষীদের কাছে অল্প দামে কেনা জিনিস বেশী দামে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করে।

গ্রামবাসীদের আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা গ্রামে নাই বলিলেই চলে। মানুষকে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিতে হইলে দেহ ও মন দুইয়েরই খোরাক দরকার। পল্লীবাসীদের দেহের খোরাক একরকম জোটে, কিন্তু মনের খোরাকের অভাব। যখন গ্রামগুলি উন্নত ছিল, তখন যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান, কবির গান, বেহুলার গান প্রভৃতি একই সঙ্গে গ্রামের লোকেদের আনন্দ ও শিক্ষা পরিবেশন করিত। কিন্তু থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি সস্তা শহুরে আমোদ আমদানির ফলে আগেকার দিনের গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদ লোপ পাইয়াছে। বিশুদ্ধ আমোদের অভাবে গ্রামের মানুষ পরনিন্দা, পরচর্চা, ঝগড়া-মারামারি ও নেশা-ভাঙ্গ করিয়া অবসরকাল কাটায়।

সমাজ মিলন-কেন্দ্র (Community Centre)

উপরে যে সমস্যাগুলির কথা বলা হইল, এগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। একটির পর আর একটি বা একটিকে বাদ দিয়া আর একটি সমস্যা সমাধান করা চলে না। সবগুলি সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে সুরু করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই Community Centre বা সমাজ মিলন কেন্দ্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

Community Centre স্থাপিত হইবে গ্রামের মধ্যে কিংবা গ্রামের নিকটে কোন ফাঁকা জায়গায়। ইহা কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নিকটে অবস্থিত হইলে ভাল হয়। সমাজ মিলন-কেন্দ্রের সংলগ্ন থাকিবে বেশ

খানিকটা খোলা জায়গা। সকালে ৬ হইতে ১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকিবে। দুপুরে গ্রামের মেয়েরা কেন্দ্রে মিলিত হইবেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা কিংবা গ্রাম সেবিকারা মেয়েদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবেন, তাঁহাদের রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের গল্প পড়িয়া শুনাইবেন। সেলাই, কাতাই, বোনাই প্রভৃতি হাতের কাজ শিখাইবার ভারও থাকিবে শিক্ষিকা ও গ্রাম সেবিকাদের উপর। কখন কখন তাস, লুডো, ক্যারম প্রভৃতি খেলা করিবার সুযোগ দিতে হইবে। রাত্রে সামাজিক শিক্ষা-কেন্দ্রে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সারাদিন কাজের পর গ্রামের চাষী ও অন্যান্য অশিক্ষিত ব্যক্তি জমা হইবেন। এখানে গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সংবাদপত্র হইতে বিশেষ বিশেষ খবরগুলি পাঠ করিয়া শুনানো হইবে। তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলাধূলা ও গান-বাজনার ব্যবস্থাও থাকিবে। ইহা হইবে গ্রামের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। এখানে গ্রামবাসীরা পরস্পরের সহযোগিতায় নানাধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রেরণা পাইবেন।

প্রত্যেক সমাজ মিলন-কেন্দ্রে (Community Centre) একটি Radio ও ছোটখাটো একটি করিয়া লাইব্রেরী থাকিবে। Radio-র সাহায্যে গ্রামবাসীদের দেশ-বিদেশের খবর শুনানো হইবে এবং গান-বাজনাও গ্রামের লোকেদের আনন্দ বর্ধন করিবে। গ্রামের মধ্যে যদি যাত্রার দল, রামায়ণ গায়ক, কথক প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে মাঝে মাঝে যাত্রা, রামায়ণ গান, কথকতা প্রভৃতির আয়োজন করা যাইতে পারে। গ্রামে অনেক যুবক থাকে, যাহারা বাড়ীর সামান্য কাজকর্ম করা ছাড়া বাকী সময় আলস্যে কাটায়। Community Centreএর কর্মীদের উচিত তাহাদের সহায়তায় গ্রামে যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি বৎসরে অন্ততঃ দুই-একবার অনুষ্ঠান করা।

গ্রামে স্কুলের ছাত্র ও যুবকদের উৎসাহ দিয়া একটি club করা উচিত। এখানে খেলাধূলা ও নানারকম শরীর-চর্চার ব্যবস্থা থাকিবে। স্বাধীনতা

দিবস, মহাপুরুষদের জন্ম-দিবস প্রভৃতি আনন্দোৎসব পালন করিয়া গ্রামের লোকের শুষ্ক ও নীরস জীবন সুখের করা যাইতে পারে।

সমাজ মিলন-কেন্দ্র বা Community Centreএর পরিচালনায় গ্রামের উৎসাহী যুবক ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লইয়া একটি Health Squad গঠন করা যাইতে পারে। গ্রামের মধ্যে যে সকল খানা-ডোবা আছে সেই সব স্থানে মশা জন্মাইয়া গ্রামে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হয়। Health Squad এই সকল স্থানে কেরোসিন তৈল ও D. D. T.-র সাহায্যে মশা মারিবার ব্যবস্থা করিবে। গ্রামে অনেক লোক থাকে যাহাদের কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায় অসুখের সময় কেহ যত্ন করিবার থাকে না। Health Squadএর কাজ হইবে এই সব লোকের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করা সহজ, কিন্তু গ্রামের লোকেদের স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য প্রতি বৎসর পল্লী অঞ্চলে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। Community Centreএর কর্মীদের উচিত magic lanternএর সাহায্যে গ্রামের লোকদের বুঝাইয়া দেওয়া এই সকল রোগ কেন হয় এবং কি করিয়া ইহাদের প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকেদের দেখা যায় যে, তাহারা ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অবহিত হইলেও সামাজিক স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে উদাসীন। গ্রামে যে পুকুরের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সে পুকুরেই লোকে স্নান করে, কাপড়-চোপড় কাচে, এমনকি গরু-বাছুরকেও স্নান করায়। নিজেদের বাড়ীর অপরিষ্কার জল রাস্তায় ফেলা হয় এবং বাড়ীর আবর্জনাও রাস্তার উপর ফেলা হয়। Community Centreএর কর্মীদের একটি কাজ হইতেছে যে, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত করা।

পূর্বে আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া গ্রাম অঞ্চলে নানা উপলক্ষে মেলা হইত। এই সব মেলাতে নিকটবর্তী গ্রামসমূহের লোকেদের মেলা-

মেশার একটা সুযোগ হইত। গ্রামের চাষী ও শিল্পীদের উৎপন্ন জিনিসের বেচা-কেনার একটা সুযোগ হইত। তাহা ছাড়া মেলায় যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি নির্দোষ আনন্দের ব্যবস্থা থাকিত। আজকাল অনেক স্থান হইতে মেলা উঠিয়া গিয়াছে। যেখানে এখনও টিকিয়া আছে সেখানে ইহার অনেক অবনতি হইয়াছে। মেলাগুলি হইয়াছে জুয়াখেলার আড্ডা এবং কতকগুলি তেলে-ভাজা অনাবৃত খাবার বিক্রয় করিবার কেন্দ্র। Community Centre-এর কর্মীদের একটি কাজ হইবে এই সকল মেলাকে আবার প্রাণবন্ত করিয়া তোলা। প্রত্যেক মেলায় একটি করিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। গান, কবি, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মেলার মধ্যে একটি উপযুক্ত স্থানে একটি stall খুলিয়া মেলায় আগত লোকেদের দেশের বিভিন্ন বিষয়ে পৃথিবীতে ও আমাদের দেশে কোন্ কোন্ দিকে কতটা উন্নতি হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

গ্রামের লোকেরা আপৎকালীন প্রাথমিক উপায়গুলি সম্বন্ধেও অজ্ঞ। অনেক সময় দেখা যায়, হাত-পা কাটিয়া গেলে ধূলা দিয়া রক্ত বন্ধ করা হয়। সাপে কামড়াইলে ওঝা ডাকা হয়। কোন কারণে কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িলে ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়া ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছেলেমেয়েকে ভূত-প্রেত বা যোগিনী-ডাকিনীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বুকে থুথু দেওয়া হয়। গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে টিকা বা ইন্‌জেক্‌সনের পরিবর্তে দেবতার 'মানসিক' করা হয়। Community Centreএর কর্মীদের কর্তব্য, গৃহস্থ বাড়ীর কর্তা ও গৃহিণীদের রোগের প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid) সম্বন্ধে অবহিত করানো।

Community Centre গ্রামের প্রকৃত সাংস্কৃতিক মিলন-ক্ষেত্র। এখানে গ্রামের সব রকম উৎসব, সভা-সমিতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্ম অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী সম্পন্ন হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, গ্রামের বিভিন্ন স্থানে একই রকম পূজা-পার্বণ বা উৎসব পালন হইতেছে। একই অনুষ্ঠান বিভিন্ন

জায়গায় সম্পন্ন হইলে অর্থব্যয়ও বেশী হয় এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইবারও সম্ভাবনা থাকে। গ্রামের সকল লোক মিলিতভাবে Community Centreএর প্রাঙ্গণে যদি সার্বজনীনভাবে উৎসব পালন করেন, তাহা হইলে উৎসবটিও সুন্দর হয় এবং গ্রামের লোকেদের মধ্যে একতা-বোধও জাগরিত হয়। এ বিষয়ে Community Centreএর কর্মিগণকেই অগ্রসর হইতে হইবে। গ্রামবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া সর্ববিষয়ে গ্রামবাসীদের পরামর্শদাতা ও বন্ধুর স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গের বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা কথাটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য ইহার আর একটি নাম দেওয়া হইয়াছে সামাজিক শিক্ষা। সমাজে বাস করিয়া ভালভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে সাধারণ মানুষের যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষাই হইল সামাজিক শিক্ষা। আমাদের চারিদিকে অনেক অজ্ঞ নিরক্ষর বয়স্ক লোক রহিয়াছে। তাহাদের অনেকেই শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্যই বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া থাকা ছাড়া যেন তাহাদের জীবনের অন্য কোন অর্থ নাই। পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ পায় নাই তাহারা এতটুকুও। বয়স্ক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল সমাজের এই বঞ্চিতদের প্রকৃত বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকার পথ দেখাইয়া দেওয়া, পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ যতটুকু সম্ভব তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

সমাজে ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অন্ততঃ সামান্য কিছু লেখাপড়া

জানা চাই। শরীর ভাল রাখিবার যে সকল নিয়ম আছে সেইগুলি জানা থাকা চাই। নাগরিক হিসাবে মানুষের কি অধিকার আছে, কি কর্তব্য আছে, তাহা জানা চাই, নির্দোষ আনন্দে অবসর কাটাইবার সুযোগ চাই। তাহা ছাড়া নিজের অবস্থার কিসে উন্নতি হয়, তাহাও জানা চাই। তাই সামাজিক শিক্ষার কাজ হইল কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া দেওয়া, শরীর ভাল রাখিবার নিয়ম বুঝাইয়া দেওয়া, অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে নাগরিকদের সচেতন করিয়া দেওয়া, নির্দোষ আনন্দে অবসর কাটাইবার উপায় বলিয়া দেওয়া, আর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার পথ বলিয়া দেওয়া।

প্রথমতঃ লেখাপড়ার কথা ধরা যাক। মানুষের আশেপাশে কত গাছ-পালা, পশুপক্ষী, গ্রহনক্ষত্র রহিয়াছে। ইহারা মানুষের উপকারও করিতে পারে, আবার অপকারও করিতে পারে। ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইহাদের কথা জানা দরকার। যে পড়িতে শিখিয়াছে সে সহজে বই পড়িয়া এই সবের কথা জানিতে পারে। যে পড়িতে শিখে নাই তাহাকে এসব জানিতে হইলে অন্যের মুখে শুনিতে হইবে। তাহা সকল সময় সম্ভব নয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের চারি ভাগের তিন ভাগ লোকই নিরক্ষর। ইহাদিগকে এই সব কথা জানাইতে হইলে কিছুটা লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। তাই বয়স্ক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষার প্রধান কাজ হইল নিরক্ষর বয়স্কদের লেখাপড়া শিখানো। ইহা প্রধান কাজ, কিন্তু ইহাই একমাত্র কাজ নহে— একথা মনে রাখিতে হইবে।

এইবার শরীর ভাল রাখার নিয়মের কথা বলি। শরীর-পালনের নিয়ম না জানিলে এবং সেগুলি পালন না করিলে মানুষ রোগে ভোগে, অপরকেও রোগে ভোগায়, নিজে বিপন্ন হয়, অপরকেও বিপন্ন করে। তাই সামাজিক শিক্ষার আর একটা কাজ হইল সাধারণ মানুষকে শরীর-পালনের নিয়ম সম্বন্ধে সচেতন করা।

আমাদের দেশে এখন যে শাসন-ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয়

গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে নাগরিকগণ নিজেরাই নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। যাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করে, তাহারা দেশের লোকদের ভাল-ভাবে বাঁচিয়া থাকার নানারকমের ব্যবস্থাই করিতে পারে। তাহারা স্কুল স্থাপন করিতে পারে, হাসপাতাল স্থাপন করিতে পারে, নলকূপ বসাইতে পারে, রাস্তাঘাট তৈয়ারি করিতে পারে, চোর-ডাকাতের হাত হইতে নাগরিকদের রক্ষা করিতে পারে। তাহারা এমন আরও অনেক কিছুই করিতে পারে এবং করাও তাহাদের কর্তব্য। গণতন্ত্রে সকল নাগরিকই যখন শাসন পরিচালনা করে, তখন এসকল করার অধিকার এবং দায়িত্ব সকল নাগরিকেরই আছে। আমাদের অজ্ঞ জনসাধারণ কিন্তু স্পষ্টভাবে জানে না নাগরিক হিসাবে কি তাহাদের অধিকার, কি তাহাদের কর্তব্য। তাই সামাজিক শিক্ষার আর একটা কাজ হইল সাধারণ মানুষকে তাহাদের অধিকার এবং কর্তব্যগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।

মানুষকে ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নির্দোষ আনন্দে অবসর কাটাইবার সুযোগ থাকা চাই। আমাদের দেশের অজ্ঞ জনসাধারণ সে সুযোগ পায় না। সঙ্গীত, অভিনয়, কথকতা, ছায়াচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে ভালভাবে অবসর সময় কাটানো যায়। এইগুলি আবার জন-শিক্ষার উপায়ও বটে। সামাজিক শিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষার তাই আর একটা কাজ হইল জন-সাধারণকে এধরনের সুযোগ দেওয়া।

ভালভাবে বাঁচিয়া থাকার পথে দরিদ্র জনসাধারণের সব চাইতে বড় বাধা হইল তাহাদের আর্থিক দুরবস্থা। তাই সামাজিক শিক্ষার আর একটা বড় কাজ হইল দরিদ্র জনসাধারণকে তাহাদের আয় বাড়াইবার উপায় দেখাইয়া দেওয়া। কাজটা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব মোটেই নয়। একজন কৃষিকাজ করে। উন্নতধরনের কৃষির পদ্ধতি যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় বা অবসর সময়ে কোন কুটিরশিল্প চালাইবার পরামর্শ যদি তাহাকে দেওয়া যায়, তবে তাহার আয় বাড়ে, কষ্টের লাঘব হয়।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে বয়স্ক শিক্ষার কাজ সুরু হইয়াছে ১৯৪৯ সালে। সেই হইতে আজ পর্যন্ত নানা কাজের মধ্য দিয়া বয়স্ক শিক্ষার কাজ অগ্রসর হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির কথা বলা যাইতে পারে। মোটামুটি ১৪ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রী-পুরুষকে বয়স্ক বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই বয়সের অজ্ঞ নিরক্ষরদের জন্য এখন পশ্চিমবঙ্গে সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রায় তিন হাজার বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র আছে। এই সকল কেন্দ্রে নিরক্ষর বয়স্কদের লিখিতে পড়িতে শিখানো হয়, আলোচনার সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম বুঝাইয়া দেওয়া হয়, আয় বাড়াইবার উপায় বলিয়া দেওয়া হয়। এই সকল কেন্দ্রে নানা উপায়ে অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থাও আছে। কোন কোন কেন্দ্রে হাতে-কলমে ছোটখাট কুটিরশিল্পের কাজও শিখানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই সকল বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রে এ পর্যন্ত মোট সওয়া দুই লক্ষ নিরক্ষর বয়স্ক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। প্রতি বৎসর কেন্দ্রগুলির নানা কাজে যোগদান করিতেছে প্রায় তিন লক্ষ লোক।

বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রে যাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহাদের আরও লেখা-পড়া শিখিবার সুযোগ দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে নূতন পাঠাগার বা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্ব হইতেই যে সকল পাঠাগার বা গ্রন্থাগার ছিল, সেই-গুলিকে পুস্তক ও আসবাবপত্র কিনিবার জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে নূতন-পুরাতন মোট প্রায় চৌদ্দ শত পাঠাগার বা গ্রন্থাগারকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই সবগুলিতে সদ্য যাহারা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, তাহাদের পড়ার উপযোগী বইও রাখা হইয়াছে। সেইজন্য অন্য পাঠকদের মত সদ্য লেখাপড়া-শেখা পাঠকেরাও এখানকার বই পড়িতে পারে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট এই সকল পাঠাগারে বা গ্রন্থাগারে মোট বইএর সংখ্যা প্রায় আটাশ লক্ষ, আর পাঠক-সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ইহাদের মধ্যে প্রায় ষাট হাজার সদ্য লেখাপড়া-শেখা।

এইগুলি ছাড়াও সরকার আঠারটি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং ২৬৪টি পল্লী গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন। এ গ্রন্থাগারগুলিও পরোক্ষ-ভাবে সামাজিক শিক্ষার কাজে সাহায্য করিতেছে।

সদ্য লেখাপড়া শিখিয়াছে এমন বয়স্কদের পড়িবার উপযোগী বইএর অভাব ছিল আমাদের। সে অভাব পূরণ করিবার জন্য সরকারী ব্যয়ে এ পর্যন্ত তিনটি সাহিত্য কর্মশালা পরিচালিত হইতেছে। প্রত্যেকটি সাহিত্য কর্মশালায় অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের পরিচালনায় অনধিক বিশজন সাহিত্যিক দেড় মাসকাল বয়স্কদের উপযোগী সাহিত্য রচনার রীতি আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই রীতিতে প্রত্যেকে একখানা করিয়া বই রচনা করিয়াছেন। এ পর্যন্ত এধরনের প্রায় চল্লিশখানা বই সরকারী ব্যয়ে ছাপা হইয়াছে এবং বিতরণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সাহিত্য কর্মশালার বাহিরে এই সকল সাহিত্যিক এবং অন্য সাহিত্যিকেরাও এধরনের বই লিখিয়াছেন। ফলে এই অভাব কিছুটা পূরণ হইয়াছে।

যাত্রা, কথকতা, কবি, লোকনৃত্য প্রভৃতির সাহায্যে লোক-শিক্ষার রীতি আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই ছিল। এইগুলির সুবিধা হইল এই যে, একদিকে যেমন এইগুলি লোক-শিক্ষার সাহায্য করে, অপরদিকে অবসর সময়ে লোকেদের নির্দোষ আনন্দও দেয়। পড়িতে জানুক বা না জানুক আমাদের দেশে এমন বয়স্কের সংখ্যা কম যাহারা রামায়ণ, মহাভারতের আখ্যান জানে না। যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির সাহায্যেই অনেকে এসব জানিয়াছে। বিদেশী ভাবধারার প্রভাবে ধীরে ধীরে এগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছিল। সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে এখন এ সকল অনুষ্ঠানের জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ফলে আমাদের দেশের এই ধরনের লোক-শিক্ষার রীতি নূতন উদ্যমে চালু হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এ উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল চৌত্রিশ হাজার

টাকা। সরকারী সাহায্যে প্রতি বৎসর প্রায় আটশত অনুষ্ঠান হয় এবং তাহাতে যোগদান করে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক।

পড়িয়া যেমন লোকে শিখিতে পারে, তেমন দেখিয়া-শুনিয়াও তাহারা শিখিতে পারে। এমন লোক আছে যাহারা পড়িতে পারে না এবং পড়িতে চায় না। তাহাদের পক্ষেও দেখিয়া-শুনিয়া শিখাই সহজ। দেখিয়া-শুনিয়া শিখিলে মনের উপর ছাপও থাকে অনেকদিন। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামাজিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ছায়াচিত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, বেতার যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪১৯টি অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল; তাহাতে প্রায় এক লক্ষ লোক যোগদান করিয়াছিল।

দেশের যুবকেরা যাহাতে গঠনমূলক কাজে যোগদান করার উৎসাহ এবং শিক্ষা পায়, সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বৎসর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলার যুবকদের জন্য কর্ম-শিবিরের আয়োজন হয়। প্রত্যেক শিবিরের কাজ চলে এক মাস কাল, আর তাহাতে যোগদান করে পঞ্চাশজন যুবক। ১৯৫৬-৫৭ সালে এধরনের একান্নটি কর্ম-শিবিরে যোগদান করিয়াছিল প্রায় আড়াই হাজার যুবক এবং সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হইয়াছিল প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া অনেক ভাল ভাল কাজ করিতে পারে। অবশ্য এসব কাজের জন্য গ্রামে কুশলী নেতার দরকার হয়। অনেক গ্রামেই তেমন নেতা নাই। এই ধরনের নেতৃত্ব শিক্ষা দিবার জন্য চব্বিশ পরগণার বাণীপুরে এবং দার্জিলিংএর কালিম্পং-এ দুইটি জনতা কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথমটিতে এককালীন ত্রিশজন এবং দ্বিতীয়টিতে এককালীন বিশজন করিয়া শিক্ষার্থীকে দুই মাসকাল শিক্ষা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত এই কলেজ দুইটিতে প্রায় ৮০০ কর্মীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা যাহাতে একটি জায়গায় মিলিত হইয়া নিজেদের মঙ্গলের জন্য নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে পারে, গঠনমূলক কাজের জন্য

তৈয়ারি হইতে পারে, লেখাপড়া করিতে পারে এবং নির্দোষ আনন্দ-উৎসব করিতে পারে, সেজন্য এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারোটি সমাজ মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেকটির জন্য বেশ বড় হলঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে এবং নানা আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তেতাল্লিশটি ছোট পল্লী-বিদ্যালয়ের সঙ্গে আবার একটু ছোটরকমের সমাজ মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এইগুলিকে বলা হয় বিদ্যালয়-বনাম-সমাজ মিলন-কেন্দ্র। এই উভয় প্রকার কেন্দ্রে নানা কাজে যোগদান করিতেছে এখন প্রায় দশ হাজার লোক।

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয় সম্প্রসারণ আন্দোলন

পল্লী-বহুল ভারতের উন্নতি বিধান করিতে হইলে প্রথম পল্লীর দিকেই নজর দিতে হইবে। ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত আছেন। বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পল্লীর উন্নতির চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। গ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য সামগ্রিকভাবে কোন চেষ্টা হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত কৃষি, পশু, সমবায়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সরকারের বিভিন্ন শাখা গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই সব শাখার প্রত্যেকটিই অন্য শাখা-নিরপেক্ষভাবে কেবল নিজেদের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে। কোন একটি সাধারণ লক্ষ্য তাহাদের ছিল না।

বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামোন্নয়নের চেষ্টার ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্মচারিগণ নিজ নিজ বিভাগীয় কাজ লইয়া

গ্রামবাসীদের নিকট যখন অগ্রসর হন, তখন গ্রামের অর্ধ-শিক্ষিত অধিবাসীরা ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া যায়। সরকারের বিভিন্ন শাখার মত গ্রামবাসীদের জীবনের সমস্যাগুলিকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা যায় না। অতএব গ্রামের সমস্যা সমাধান সরকারের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে না করিয়া গ্রামোন্নয়নের জন্য একটি বিভাগের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। তারপর দ্বিতীয় কথা হইতেছে যে, গ্রামের উন্নতির প্রেরণা গ্রামবাসীদের নিজেদের তরফ হইতেই আসা উচিত। সমস্যা তাহাদের নিজেদের এবং সমস্যা সমাধানেও তাহাদের দান আছে, এই ধারণা গ্রামবাসীদের মনে না জন্মাইতে পারিলে সত্যিকার গ্রামোন্নয়ন কাজ খুব অগ্রসর হইবে না। স্বাবলম্বনই হইতেছে সকল উন্নতির গোড়ার কথা। সরকার হইতে বড়জোর সরবরাহ, সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থা ও ঋণদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু পল্লী অঞ্চলে যে বিরাট কর্মশক্তি ঘুমাইয়া আছে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব।

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

গ্রামের সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কি ধরনের সংস্থা প্রয়োজন, এ বিষয়ে বহু পূর্ব হইতেই সরকার চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৬ সালে কৃষি-বিভাগ সম্পর্কিত Royal Commission পাঞ্জাবে Mr F. L. Brain কর্তৃক উদ্ভাবিত গ্রাম-পরিচালক প্রথার অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত Fiscal Commission নিম্ন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"আমরা একজন সম্প্রসারণ-অধিকারিকের কথা চিন্তা করিতেছি। তিনি তাঁহার অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক লোক লইয়া কৃষিজাত দ্রব্যাদি হাতে-কলমে উৎপাদন করিয়া দেখাইবার উপযুক্ত একটি প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিবেন এবং এইভাবে সেখান হইতে ৪০।৫০টি গ্রামের সেবা করিবেন। গ্রাম-উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার ভার যে সকল বিভিন্ন উন্নয়ন-বিভাগের উপর থাকিবে, তিনি

তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। আবার অপর পক্ষে তিনিই হইবেন তাঁহার এলাকার চাষীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পথপ্রদর্শক।"

১৯৫২ সালে খাদ্য-উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে সুপারিশ করিয়াছেন যে, একান্তভাবে গ্রাম সেবা করিবার জন্য এমন একটি সংস্থা গড়িয়া তোলা দরকার যে সংস্থা প্রত্যেকটি কৃষকের সংস্পর্শে আসিবে এবং গ্রাম্য জীবনে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সামগ্রিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে। এই কমিটি সুপারিশ করেন যে, ভারপ্রাপ্ত একজন উন্নয়ন অথবা সম্প্রসারণ অধিকারিকের অধীনে ১০০ হইতে ১২০টি গ্রামযুক্ত একটি তালুক বা তহসিলই হইবে কাজ চালাইবার পক্ষে সুবিধা-জনক এক-একটি উন্নয়ন ব্লক।

কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ ১৯৫২ সালে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চালু করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং এই সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্মতিথিতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫৫টি সমাজ-উন্নয়ন প্রজেক্ট খোলা হয়। ১৯৫৩ সালে পর পর দুই কিস্তিতে আরও কতকগুলি প্রজেক্টের কাজ সুরু করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৩৩টি উন্নয়ন ব্লক আছে।

উদ্দেশ্য ঃ

সমাজ-উন্নয়ন প্রজেক্টের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে গ্রামের তথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। সরকারের সাহায্য, জন-সাধারণের প্রেরণা এবং সহযোগিতার দ্বারা গ্রামের অধিবাসীদের জীবন-ধারণের মান উন্নত করা যাইতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ নিম্নলিখিত কাজগুলির উপর জোর দিয়াছেন ঃ—

(১) কৃষির উন্নতি ;

(২) গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা দূরীকরণ ;

(৩) গ্রামের যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতি ;

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ;

(৫) জন-স্বাস্থ্যের উন্নতি ;

(৬) গ্রামের অধিবাসীদের নির্দোষ আনন্দ পরিবেশন ;

(৭) উন্নতধরনের বাড়ী-ঘর নির্মাণ ;

(৮) গ্রামের হস্ত-শিল্প ও ছোট ছোট ব্যবসায়ের উৎসাহ দান।

কৃষি সম্বন্ধে যে কর্মসূচী তৈয়ারি করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে আছে পতিত জমি কৃষির উপযোগী করা, ছোট ছোট সেচ-খাল কাটাইয়া চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা। চাষের উপযুক্ত জমির অন্ততঃ অর্ধেকে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা করা সরকারের লক্ষ্য। চাষের মামুলী যন্ত্রপাতির পরিবর্তে উন্নতধরনের যন্ত্রপাতি, ভাল সার ও ভাল বীজ সরবরাহ করাও উন্নয়ন বিভাগের পরিকল্পনার অন্তর্গত। আমাদের দেশে চাষীদের বলদ ও মহিষ যাহাতে অধিক শক্তিশালী হয়, তাহার ব্যবস্থাও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কৃষি-বিষয়ক পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিবার জন্য প্রতি পাঁচটি গ্রামের জন্য থাকিবেন একজন করিয়া কৃষি-সম্প্রসারণ কর্মী (Agricultural Extension Worker)। সমবায় পদ্ধতিতে যাহাতে গ্রামের কৃষিকার্য পরিচালিত হয় এবং প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে অন্ততঃ একটি করিয়া সর্বার্থসাধক সমিতি (Multipurpose Society) প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন Agricultural Extension Worker.

রাস্তা-নির্মাণের পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতেছে, প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গ্রামের সহিত সরকারী বড় পথের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা। এই ছোট ছোট রাস্তা গ্রামের লোকেদের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তৈয়ারি হইবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষার বিস্তারই হইতেছে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান কর্মসূচী। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং গ্রাম ও শহর অঞ্চলের কারুশিল্পীদের সর্বতোভাবে উৎসাহ দেওয়া হইবে।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য-বিভাগীয় কাজের একটা কর্মসূচী করা

হইয়াছে। প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লকে থাকিবে তিনটি করিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্র এবং প্রজেক্টের প্রধান কার্যালয়ে থাকিবে একটি বৃহত্তর স্বাস্থ্য-কেন্দ্র ও একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, আবর্জনা অপসারণ এবং সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ দ্বারা পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য-উন্নয়নের চেষ্টা করা হইবে। উন্নতধরনের গৃহ-নির্মাণ-কৌশল গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। জনবহুল গ্রামে বসবাসের জন্য নূতন স্থান নির্বাচন করা হইবে, খেলিবার স্থান নির্ণয় করা হইবে এবং বাড়ী তৈয়ারি করিবার উপযুক্ত মাল-মসলা যোগাড় করিয়া দেওয়া হইবে। কুটিরশিল্প এবং ছোট ছোট শিল্পের প্রসার দ্বারা গ্রামের বেকারদের কর্ম-সংস্থান করিবার চেষ্টা করা হইবে।

পরিচালন-ব্যবস্থা (Administration):

কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ-উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রী আছেন। পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) অন্তর্গত কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Committee) সমাজ-উন্নয়ন বিভাগের পরিচালনা করেন। এই কেন্দ্রীয় সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য একটি পরামর্শ দাতা পর্ষৎ (Advisory Board) আছে। Advisory Boardএর সভ্য হইতেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিভাগের সচিববৃন্দ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা (Natural Resources and Scientific Research) বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং ভারত-আমেরিকা কারিগরী অর্থ-ভাণ্ডারের ভারতীয় প্রতিনিধি।

এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হইতেছেন সমাজ-উন্নয়ন-পরিচালক (Administrator of Community Projects) এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি অফিস ও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছেন। উন্নয়ন-পরিচালককে উপদেশ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন পরামর্শদাতা আছেন। প্রত্যেক রাজ্যে উন্নয়ন-সমিতি (Development

Committee) আছে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও উন্নয়ন বিভাগের-ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং উন্নয়ন কমিশনার (Development Commissioner) এই সমিতির সভ্য। প্রত্যেক জেলায় আবার একটি জেলা উন্নয়ন বা পরিকল্পনা সমিতি (District Development or Planning Committee) থাকিবে। জেলা-সমাহর্তা (District Magistrate) হইতেছেন এই সমিতির সভাপতি এবং জেলা-উন্নয়ন-অধিকর্তা (District Development Officer) ইহার সচিব। এই উন্নয়ন-বিভাগের প্রধান কর্মী হইতেছেন গ্রামসেবক। তিনি গ্রামবাসীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাহাদের নানা বিষয়ে উপদেশ দেন। গ্রামসেবকের অধীনে আবার কয়েকজন গ্রাম-কর্মী (Village Level Worker) আছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফতই উন্নয়ন কাজ করা হয়।

অর্থনৈতিক দিক ঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়ন খাতে ৯১·৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ; কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণের (Community Development and National Extension) জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকার এবং জনসাধারণের নিকট হইতেই সমাজ-উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আসে। সমাজ-উন্নয়নের কাজের জন্য এককালীন খরচের তিন ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক ভাগ রাজ্য সরকার বহন করেন। কিন্তু পৌনঃপুনিক খরচ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হয়। জলসেচ, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতি উৎপাদনমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ঋণ হিসাবে রাজ্য সরকারকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের বাবদ খরচের অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন।

ভারত-আমেরিকা কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ফোর্ড প্রতিষ্ঠান (Indo-U. S. Technical Co-operation Scheme and Ford Foundation) হইতেও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। স্থির হইয়াছিল যে, Indo-U. S. Technical Co-operation Fund হইতে Community Project-এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য ১৯৫২-৫৩ সাল হইতে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত ১,২৭,১১,৮৬০ ডলার অর্থসাহায্য পাওয়া যাইবে এবং তাহা ছাড়া কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এ বিষয়ে ভারতকে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাওয়া যাইবে। ফোর্ড প্রতিষ্ঠান সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহা ছাড়া Ford Foundation হইতে গ্রামাঞ্চলে ১৫টি Pilot Project পরিচালনা করা হইতেছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য (National Extension Service) :

গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য নামে একটি নূতন পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে। ১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর হইতে ভারতের সকল রাজ্যেই এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই এবং একই উন্নয়ন-বিভাগ দুই দিকেরই কার্য পরিচালনা করেন। কৃষিকার্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে চাষীদের অবহিত করা এবং গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা এই জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার লক্ষ্য। জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি জিনিসের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় :—

(১) গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য পরস্পর-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিকের প্রতি একই সঙ্গে নজর দেওয়া হইবে।

(২) কাজের প্রেরণা আসিবে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে।

(৩) সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের সমস্ত সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

জাতীয় সম্প্রসারণ বিভাগের কার্যের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বর্তমানে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়েই বিশেষ করিয়া মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে :—

(১) সার বিতরণ ;

(২) বীজ বিতরণ ;

(৩) ফলের গাছ রোপণ ;

(৪) পতিত জমির উদ্ধার ;

(৫) চাষের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা ;

(৬) পশু-চিকিৎসা ;

(৭) কাঁচা রাস্তা তৈয়ারি করা ;

(৮) পাকা রাস্তা তৈয়ারি করা।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিবার চেষ্টা করা হইল। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হইল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা আমাদের দেশের জনসাধারণকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে আদর্শবাদিতার পথে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই প্রচেষ্টা হইল সামাজিক দিক হইতে সমাজ পুনর্গঠনের একটি মহান উদ্যোগ। এই পরিকল্পনার কাজ দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনার পশ্চাতে যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহাই লক্ষণীয় বিষয়। "জন-সহযোগিতার ভিত্তিতে আত্ম-নির্ভরশীলতা" প্রতিষ্ঠিত করাই এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।